নুসুস সিরিজ-০৩

আস সারিমুল মাসলুল

আলা শাতিমির রাসূল

ইমাম ইবনে তাইমিয়্যা

৬৯৩ হিজরির রজব মাস। আসসাফ নামের এক খ্রিস্টান রাসূল ﷺ-কে নিয়ে কটূক্তি করল। আসসাফের বিচারের দাবিতে ফুঁসে উঠল নবীপ্রেমিক জনতা। পরিস্থিতি নাজুক দেখে তৎকালীন আমীর ইবনে আহমাদ আল-হিজাজির কাছে আশ্রয় নিল 'শাতিমে রাসূল' আসসাফ। এ পরিস্থিতিতে ইমাম ইবনে তাইমিয়্যা এবং শাইখ যায়নুদ্দীন আল-ফারকি নায়েবে আমীর ইজ্জুদ্দীন আবিক আল-হামাবি'র কাছে আসসাফের উপযুক্ত বিচার চাইলেন। নায়েবে আমীর ইজ্জুদ্দীন ডেকে পাঠালেন রাসূলকে গালিদানকারী নরাধম আসসাফকে। সমাবেত জনতা তাকে দেখে উপহাস করতে লাগল। এক আরব বেদুঈন ছিল আসসাফের সাথে। সেই বেদুঈন তার পক্ষ নিয়ে সমবেত মুসলিমদের সাথে তর্ক জুড়ে দিল। ক্রুদ্ধ জনতা দুজনকেই গণধোলাই দিল। নায়েবে আমীর ইজ্জুদিন এ ঘটনার সম্পূর্ণ দায় চাপালেন ইমাম ইবনে তাইমিয়্যা এবং শাইখ যায়নুদ্দীনের ওপর। তারাই নাকি জগণকে ফুসলিয়েছে। তাই ইজ্জুদ্দীনের নির্দেশে বেত্রাঘাত করা হলো দুজনকে । কিন্তু আসসাফের অপরাধ প্রমাণিত হওয়া সত্ত্বেও কোনো শাস্তি না দিয়ে ওকে ছেড়ে দেওয়া হলো। এ ঘটনার পর আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে গালিদাতার বিধান নিয়ে জনমনে প্রশ্ন দেখা দেয়। তারই পরিপ্রেক্ষিতে ইবনে তায়মিয়্যা رحمه الله "আস-সারিমুল মাসলুল আলা শাতিমির রাসূল" নামক কালজয়ী গ্রন্থটি রচনা করেন। শাতিমে রাসূলের একমাত্র শাস্তি যে মৃত্যুদণ্ড, তা কুরআন, হাদীস ও মহান ইমামদের বক্তব্যের আলোকে এই কিতাবে তিনি প্রমাণ করে দেখিয়েছেন। আমাদের সময়েও আসসাফের মতো অসংখ্য নরাধম মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। এই আধুনিক আসসাফদের বিধান কী হবে, এ কিতাবটি সেটা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেবে।

মুখতাসার আস-সারিমুল মাসলুল আলা শাতিমির রাসূল

মূল

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়্যাহ

সংক্ষেপায়ণ

শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে আলী আল-বা'লি হাম্বলী

অনুবাদ

মাহমুদুল হাসান, মুনিরুল ইসলাম

সম্পাদনা

মুফতি শাখাওয়াত হোসাইন

সূচিপত্র

ভূমিকা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সকল প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্য। তিনি যাকে ইচ্ছা তাকেই সীরাতে মুসতাকিম প্রদর্শন করেন। তিনি কতই-না উত্তম পথপ্রদর্শনকারী। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। এই সাক্ষ্য বান্দাকে কুফরের কলুষতা থেকে মুক্ত করে। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল এবং বান্দাদের মধ্যে সর্বোচ্চ সম্মানিত।

আল্লাহ তাআলা তাঁকে পাঠিয়েছেন হিদায়াত ও সত্য দ্বীন দিয়ে, যেন তিনি এই দ্বীনকে সকল দ্বীনের ওপর বিজয়ী করতে পারেন—যদিও কাফেররা তা অপছন্দ করে।

তাঁর জন্যই সুনির্ধারিত রয়েছে সুমহান মর্যাদা, ওসিলা (জান্নাতের বিশেষ একটি স্তর), মাকামে মাহমুদ ও প্রশংসা-পতাকা—কিয়ামত-দিবসে যে পতাকাতলে সমবেত হবেন সকল প্রশংসাকারী বান্দাগণ। আল্লাহ তাআলা তাঁর ওপর সালাত ও সালাম বর্ষণ করুন, যা পবিত্র থেকে পবিত্রতম, সুন্দর থেকে সুন্দরতম এবং বিশুদ্ধ থেকে বিশুদ্ধতম; কিয়ামত পর্যন্ত অবিরাম বর্ষিত হোক এই সালাত ও সালাম।

আল্লাহ তাআলা নবী মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পাঠিয়েছেন, তার মাধ্যমে আমাদেরকে হিদায়াত দিয়েছেন এবং ঘোর অন্ধকার থেকে বের করে আলোর ফোয়ারায় উপনীত করেছেন। তার রিসালাতের কল্যাণে আমাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতের মহাকল্যাণ দান করেছেন। আর যে অভিশপ্ত তাঁর মানহানি করবে, তার বিধান প্রকাশ করা এবং তার শাস্তি কত ভয়াবহ হবে তা বর্ণনা করা আমাদের জন্য

অপরিহার্য করেছেন।

এখানে আমাদের উদ্দেশ্য হলো শরয়ি হুকুম উল্লেখ করা, যার ওপর ভিত্তি করে একজন ফকিহ ফাতওয়া দিবেন এবং বিচারক ফয়সালা করবেন। প্রত্যেকের জন্য জরুরি হলো এই কাজটিকে নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী বাস্তবায়ন করা। আল্লাহ তাআলাই হিদায়াতদাতা, সর্বোত্তম পথপ্রদর্শক।

এই বিধানটি চারটি মাসআলায় বিভক্ত।

১) গালিদাতা, বিদ্রুপকারী, কটূক্তিকারীকে হত্যা করা ওয়াজিব, চাই সে মুসলিম হোক কিংবা কাফের।

২) যদি যিম্মিও হয় তবুও তাকে হত্যা করা ওয়াজিব।

৩) যদি তাওবা করে নেয় তা হলে এর হুকুম কী?

৪) গালি বলতে কী বোঝায় ও কোন ধরনের শব্দকে গালি হিসেবে ধরা হবে?

রাসূলের কটূক্তিকারীর বিধান

কোনো মুসলিম অথবা কাফের যদি নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কটূক্তি করে, তা হলে তাকে হত্যা করা অপরিহার্য। এটাই উলামায়ে কিরামের সর্বসম্মত মাজহাব। ইমাম ইবনুল মুনযির রাহিমাহুল্লাহ বলেন,

> أجمع عوام أهل العلم على أن حد من سب النبي صلى الله عليه وسلم القتل وممن قاله مالك والليث وأحمد وإسحاق وهو مذهب الشافعي قال: وحكى عن النعمان لا يقتل

> উলামায়ে কিরাম একমত পোষণ করেছেন, যে ব্যক্তি নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে গালি দিবে, তার শাস্তি হলো কতল। ইমাম মালিক, লাইস, আহমাদ বিন হাম্বল, ইসহাক ও শাফেঈ রাহিমাহুমুল্লাহ একই কথা বলেছেন। তবে ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ সম্পর্কে বলা হয়—(তিনি বলেছেন,) যিম্মিকে হত্যা করা যাবে না।[১]

প্রসিদ্ধ শাফেঈ ইমাম আবু বকর আল-ফারসী রাহিমাহুল্লাহ আলেমদের ইজমা বর্ণনা করেন যে,

> أن حد من يسب النبي صلى الله عليه وسلم القتل كما أن حد من سب غيره الجلد

> নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছাড়া অন্য কাউকে গালি দেওয়া হলে যেমন বেত্রাঘাত করা হয়, তেমনই কোনো ব্যক্তি নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি

[১] ইবনুল মুনযির, আল-আওসাত : ২/৬৮২; হাজ্জাওয়ি, আল-ইকনা : ২/৫৮৪।

ওয়া সাল্লামকে গালি দিলে তাকে হত্যা করা হবে।[২]

এটা হলো প্রথম শতাব্দীর ইজমা অর্থাৎ সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ীদের যুগের ইজমা। শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যা রাহিমাহুল্লাহ বলেন, তাদের ইজমা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো—যদি কোনো মুসলিম নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে গালমন্দ করে, তা হলে তাকে হত্যা করা ওয়াজিব। এই মতটি কাযি ইয়ায রাহিমাহুল্লাহ শর্তযুক্তভাবে বর্ণনা করেছেন।[৩]

ইসহাক ইবনে রাহওয়াইহ রাহিমাহুল্লাহ বলেন,

أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ أَنَّ مَنْ سَبَّ الله عز وجل أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم أَوْ دَفَعَ شَيْئًا مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى أَوْ قَتَلَ نَبِيًّا مِنْ أَنْبِيَاءِ اللَّهِ تَعَالَى أنه كافر بذلك وإن كان مقرى بِكُلِّ مَا أَنْزَلَ اللهُ

মুসলিমদের সর্বসম্মত মত হলো, যে ব্যক্তি আল্লাহ অথবা তাঁর রাসূলকে কটূক্তি করে বা আল্লাহর অবতীর্ণ কোনো বিধানকে প্রত্যাখ্যান করে অথবা কোনো নবীকে হত্যা করে, তা হলে সে কাফের; যদিও সে আল্লাহর অবতীর্ণ অন্য সকল বিধানকে স্বীকার করে।[৪]

খাত্তাবি রাহিমাহুল্লাহ বলেন,

لَا أَعْلَمُ أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ اخْتَلَفَ فِي وُجُوبِ قَتْلِهِ

'রাসূলের কটূক্তিকারীকে হত্যার ব্যাপারে একজন মুসলিমও দ্বিমত করেছে বলে আমি জানি না।'[৫]

মুহাম্মাদ ইবনে সাহনুন রাহিমাহুল্লাহ বলেন,

أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ أَنَّ شَاتِمَ النَّبِيِّ ﷺ الْمُتَنَقِّص لَه كَافِر... وَمن شَكَّ فِي كُفْرِهِ كَفَر

'আলেমগণ ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যে ব্যক্তি কটূক্তি করে ও মানহানি করে, সে কাফের।

---

[২] ইবনে হাজার, ফাতহুল বারি : ১২/২৯৩।

[৩] কাযি ইয়ায, আশ-শিফা : ২/৩৮৬

[৪] ইবনে আব্দুল বার, আল-ইসতিযকার : ২/১৫০

[৫] খাত্তাবি, মায়ালিমুস সুনান : ৩/২৯৬

...এমনকি যে লোক তার কাফের হওয়ার ব্যাপারে সংশয় পোষণ করবে, সেও কাফের হয়ে যাবে।'[৬]

তা হলে চূড়ান্ত কথা হলো, শাতিম অর্থাৎ রাসূলকে গালিদানকারী যদি মুসলিম হয়, তা হলে তাকে হত্যা করা সর্বসম্মতভাবে ওয়াজিব। এটাই চার ইমাম-সহ অন্যান্যদের মত। আর যদি যিম্মি হয়, তা হলে (সামান্য মতবিরোধ আছে)। ইমাম মালিক রাহিমাহুল্লাহ ও মদীনার আলেমগণের মতে তাকেও হত্যা করা হবে। এটা ইমাম আহমাদ রাহিমাহুল্লাহ ও মুহাদ্দিসদের মত। এ বিষয়ে ইমাম আহমাদ রাহিমাহুল্লাহ একাধিক স্থানে সুস্পষ্ট বক্তব্য দিয়েছেন।

হাম্বলী মাজহাবে শাতিমি রাসূলের বিধান :

ইমাম আহমাদ রহিমাহুল্লাহ বলেন, 'এমন অভিশপ্তকে হত্যা করা হবে, চাই সে মুসলিম হোক কিংবা কাফের।' তখন ইমাম আহমাদ রাহিমাহুল্লাহকে জিজ্ঞেস করা হলো, এ ব্যাপারে কি কোনো হাদীস আছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ! অনেক হাদীস আছে। তার মধ্যে একটি হলো, অন্ধ-সাহাবি-সম্পর্কিত বর্ণনাটি। যখন তিনি শুনতে পেলেন, এক মহিলা নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে গালমন্দ করে, তখন তিনি ওই মহিলাটিকে হত্যা করেছিলেন।[৭] আরেকটা হলো হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু-কর্তৃক বর্ণিত হাদীস।[৮]

ইমাম আহমাদ রাহিমাহুল্লাহ থেকে এ মতটি নকল করেছেন হাম্বাল, আবু সাকর, খাল্লাল, আব্দুল্লাহ ও আবু তালিব।

ইমাম আহমাদ রাহিমাহুল্লাহ আরও বলেন, 'শাতিমুর রাসূলকে তাওবারও সুযোগ দেওয়া হবে না।' এই বক্তব্যটি ইমাম আবু বকর রাহিমাহুল্লাহ তার আশ-শাফি গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। সুতরাং 'শাতিম'-কে হত্যা করার ব্যাপারে ইমাম আহমাদ রাহিমাহুল্লাহ থেকে ভিন্ন কোনো মত নেই, আর (শাতিম যদি যিম্মি হয়) তা হলে তার নিরাপত্তা-চুক্তিও অকার্যকর হয়ে পড়বে।

---

[৬] কাযি ইয়ায, আশ-শিফা : ২/২১৫-২১৬

[৭] বিস্তারিত বর্ণনা সামনে আসছে।

[৮] বর্ণনাটি হলো—ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমকে একবার এক পাদরির ব্যাপারে বলা হলো যে, সে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে গালমন্দ করে। তখন ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুম বললেন, 'যদি আমি শুনতে পাই, তো আমি তাকে হত্যা করব।' [ইবনে আব্দুল বার, আত-তামহিদ : ৬/১৬৮; খাল্লাল, আল-জামি : ৭৩২]

অবশ্য কাযি আবু ইয়া'লা রাহিমাহুল্লাহ যিম্মির ব্যাপারে (ইমাম আহমাদের) ভিন্ন একটি বর্ণনা উল্লেখ করেন—'আল্লাহর রাসূলকে নিয়ে কটূক্তি করলেও যিম্মির নিরাপত্তা-বিধান বাতিল হবে না'। (হাম্বলী মাজহাবের) একদল আলেম এ মতটি গ্রহণ করেন। যেমন : শরিফ হাশিমি, ইবনে আকিল, আবুল খাত্তাবি, হুলওয়ানি প্রমুখ।

যিম্মি-কর্তৃক নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কটূক্তি করার মতো যে যে ক্ষেত্রে সমগ্র মুসলিমকে বা মুসলিমদেরকে তাদের ব্যক্তিসত্তা, অর্থ কিংবা ধর্ম নিয়ে হেয় করা হয়, সে সেমস্ত ক্ষেত্রে হাম্বলী আলেমগণ (ইমাম আহমাদের) দুটি বর্ণনা উল্লেখ করেন[১], তবে তারা সবাই একমত যে, এ ধরনের কটূক্তি দ্বারা যিম্মির নিরাপত্তা-চুক্তি বাতিল হয়ে যায়।

তাদের প্রত্যেকেই উল্লেখ করেছেন, নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি কটূক্তিকারী যদি যিম্মিও হয় তবুও তাকে হত্যা করা হবে। আর তার নিরাপত্তা-বিধানও বাতিল হয়ে যাবে।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যা রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'দুটি বর্ণনার মাঝে এটাই (যুক্তি-প্রমাণের) অধিক নিকটবর্তী। তবে অপর বর্ণনাটি—'তাদের নিরাপত্তা-চুক্তি ভঙ্গ হবে না'— কেবল তখনই প্রযোজ্য হবে, যখন যিম্মিদের সাথে (আক্রমণাত্মক কোনো কথা বলা যাবে না, এই মর্মে) কোনো শর্ত না থাকবে।'

অবশ্য এমন কোনো শর্ত থাকলেও এ ব্যাপারে দুটো বর্ণনা পাওয়া যায় :

১. যিম্মির নিরাপত্তা-বিধান ভেঙে যাবে। এমনটি উদ্বৃত করেছেন ইমাম আল-খারাকি রাহিমাহুল্লাহ এবং অভিমতটিকে বিশুদ্ধ বলেছেন ইমাম আবুল হাসান আমাদি রাহিমাহুল্লাহ।

২. তার চুক্তি ও নিরাপত্তা-বিধান বাতিল হবে না। এটি কাযি আবু ইয়া'লা রাহিমাহুল্লাহ-এর মত।

তবে আমাদের (হাম্বলী মাজহাবের) পূর্ববর্তী ফকিহগণ ও তাদের পরবর্তী অনুসারীদের সিদ্ধান্ত হলো—এ ব্যাপারে ইমাম আহমাদ রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত সুস্পষ্ট বক্তব্যগুলোকে স্ব-স্ব অবস্থায় বহাল রাখতে হবে। ইমাম আহমাদ রাহিমাহুল্লাহ স্পষ্ট অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, নবীজিকে কটূক্তিকারীর বিধান হলো তাকে হত্যা করা হবে এবং (যিম্মি হলে) তার নিরাপত্তা-বিধান বাতিল হয়ে যাবে। তেমনি যে যিম্মি

[১] একটি বর্ণনা হলো যিম্মির নিরাপত্তা-চুক্তি বাতিল হবে না, আরেকটা হলো বাতিল হয়ে যাবে।

মুসলিমদের বিরুদ্ধে গোয়েন্দাগিরি করবে বা কোনো মুসলিম নারীর সাথে ব্যভিচার করবে, কিংবা কোনো মুসলিমকে হত্যা করবে বা ডাকাতি করবে, তার হুকুমও অনুরূপ।

তবে ইমাম আহমাদ রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, যিম্মি যদি কোনো মুসলিমকে অন্যায় অপবাদ দেয় কিংবা তাকে যাদু করে, তবে এর দ্বারা তার নিরাপত্তা-চুক্তি বাতিল হবে না।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যা রাহিমাহুল্লাহ বলেন, ইমাম আহমাদের বক্তব্যগুলো যথাস্থানে বহাল রাখা অপরিহার্য। ইমামের ভাষ্যগুলোর মাঝে বাহ্যিক বৈপরীত্যের কারণে এখান থেকে (কিয়াস করে) নতুন কোনো হুকুম বের করা যাবে না।

ইমাম শাফেঈ রাহিমাহুল্লাহ থেকে স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে, এহেন গর্হিত কর্মকাণ্ডের কারণে যিম্মির নিরাপত্তা-বিধান বাতিল হয়ে যাবে এবং তাকে হত্যা করা হবে।[১০]

তবে যিম্মি-কর্তৃক আল্লাহ, রাসূল ও কুরআনের ব্যাপারে কটূমন্তব্য করা নিয়ে ইমাম শাফেঈ রাহিমাহুল্লাহ-এর অনুসারীগণ দুটো মত ব্যক্ত করেছেন। কেউ কেউ কটূকথা-সংক্রান্ত কোনো শর্ত থাকা না-থাকার মাঝে পার্থক্য করেছেন। কেউ কেউ আবার এগুলোকে (ইমাম শাফেঈর) একাধিক বক্তব্য হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

কিন্তু যে-সমস্ত কিতাবে ইমাম শাফেঈর একাধিক মতের (উল্লেখ) থাকে, সে-সমস্ত কিতাবে ইমাম শাফেঈর সুস্পষ্ট বক্তব্য উল্লেখ আছে যে, নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিয়ে যে কটূক্তি করবে তার নিরাপত্তা-চুক্তি রহিত হয়ে যাবে এবং তাকে হত্যা করা অপরিহার্য হয়ে পড়বে।

আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ ও তাঁর অনুসারীদের অভিমত হলো, কটূক্তি করার কারণে যিম্মির নিরাপত্তা-চুক্তি ভেঙে যায় না এবং তাকে এ জন্য হত্যাও করা হবে না। তবে অন্যায় প্রকাশ করার কারণে তাকে 'তাযির' হিসাবে শাস্তি দেওয়া হবে। (সে তাযীর কখনও কখনও মৃত্যুদণ্ড হতে পারে।)

কেননা হানাফীদের একটি মূলনীতি হলো—যেসব অপরাধে তাদের নিকট হত্যার বিধান নেই—যেমন ভারি বস্তু দ্বারা আঘাত করে হত্যা করা, সম্মুখপথ ছাড়া ভিন্ন পথে ব্যভিচার করা (রজম নেই), সে-সমস্ত অপরাধ যদি কেউ বারবার করে তা হলে ইমাম অপরাধীকে হত্যা করতে পারবে। আবার ইমামের অধিকার রয়েছে, তিনি যদি

---

[১০] শাফেঈ, আল-উম্ম : ৪/২০৮-২১১।

কল্যাণকর মনে করেন তা হলে নির্ধারিত হদ বা শাস্তির চেয়ে অধিক শাস্তিও দিতে পারেন।

(হানাফীগণ বলেন, শরিয়ত নির্ধারিত অন্যায় ছাড়া) অন্য যে-সমস্ত অপরাধে নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবিগণ থেকে হত্যা করার যে রেওয়ায়াত এসেছে, সে-সমস্ত ক্ষেত্রে তাঁরা মৃত্যুদণ্ডকে কল্যাণকর মনে করায় হত্যার বিধান দিয়েছেন। এ হত্যাকে তারা 'কতল বিস-সিয়াসাত' বা 'রাজনৈতিক কল্যাণ' হিসাবে অভিহিত করেন।

মোটকথা হলো, হানাফিদের মতে বারংবার করার ফলে অন্যায় যখন গুরুতর হয়, তখন তাকে হত্যা করার অধিকার মুসলিম শাসকের রয়েছে। হানাফি মাজহাবের অধিকাংশ ফকিহগণই ফাতাওয়া দিয়েছেন—যে যিম্মি নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে একাধিকবার কটূক্তি করবে ও তাঁর প্রতি ব্যাঙ্গাত্মক আচরণ করবে তাকে হত্যা করা হবে, যদিও সে ইসলাম গ্রহণ করে। তারা এটার নামকরণ করেছেন 'কতল বিস-সিয়াসাত' বা রাজনৈতিক কল্যাণের জন্য হত্যা।

শাতিমকে হত্যা করা ওয়াজিব

যে ব্যক্তি আল্লাহ, রাসূলুল্লাহ, ইসলাম ও কুরআন নিয়ে কটূক্তি করবে, তাকে হত্যা করা অপরিহার্য হয়ে যাবে আর যদি সে যিম্মি হয় তবে তার নিরাপত্তা-চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে। কুরআন, সুন্নাহ, সাহাবা-তাবেয়ীগণের ইজমা ও কিয়াস হলো এ কথার দলিল।

• **প্রথম দলিল :**

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

'আহলে কিতাবদের যারা আল্লাহর প্রতি ও পরকাল-দিবসের প্রতি ঈমান রাখে না, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যা কিছু হারাম করেছেন সেগুলোকে যারা হারাম মানে না এবং যারা সত্য দ্বীনকে অবলম্বন করে না, তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করো যতক্ষণ-না তারা অবনত হয়ে (নিজ) হাতে জিযিয়া দেয়।'[১১]

দেখুন, আল্লাহ তাআলা তাদের বিরুদ্ধে অভিযান চালানোর নির্দেশ দিয়েছেন যতক্ষণ-না তারা অবনতচিত্তে জিযিয়া আদায় করে। এখান থেকে বোঝা গেল, তাদের বিরুদ্ধে অভিযান বন্ধ রাখার কোনো সুযোগ নেই যদি না তারা জিযিয়া প্রদানের সময় অবনত হয় এবং যদি না তারা জিযিয়া প্রদানের পুরোটা সময় অবনত হয়ে থাকে।

জ্ঞাতব্য যে, জিযিয়া প্রদান বলতে বোঝায় তাদের জিযিয়া দেওয়া ও আমাদের নেওয়া-সহ জিযিয়ার সম্পূর্ণ মেয়াদকাল। সুতরাং যে যিম্মি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে কটূক্তি করে, সে তো ছোট বা অবনত হয়ে থাকা ব্যক্তি নয়। কেননা صاغر অর্থ অবনত বা ছোট এবং حقير অর্থ তুচ্ছ—তথা লাঞ্ছনা ও হীনম্মন্যতা। অথচ তাদের কীর্তি—কটূক্তি

[১১] সূরা তাওবা, ৯ : ২৯

হলো বেপরোয়া শক্তিশালী ব্যক্তির কাজ।

• **দ্বিতীয় দলিল :**

كَيْفَ وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً يُرْضُونَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ ۝ اشْتَرَوْا بِآيَاتِ اللهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝ لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ ۝ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۝ وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ

তবে তাদের ছাড়া অন্য মুশরিকদের জন্য নিরাপত্তা-চুক্তি কেমন করে হতে পারে, যখন তাদের অবস্থা হচ্ছে এই যে, তারা তোমাদের ওপর নিয়ন্ত্রণ লাভ করতে পরলে তোমাদের ব্যাপারে কোনো আত্মীয়তার পরোয়া করবে না এবং কোনো অঙ্গীকারের দায়িত্বও নেবে না। তারা মুখের কথায় তোমাদের সন্তুষ্ট করে কিন্তু তাদের মন তা অস্বীকার করে। আর তাদের অধিকাংশই ফাসেক। তারা আল্লাহর আয়াতের বিনিময়ে সামান্যতম মূল্য গ্রহণ করে নিয়েছে। তারপর আল্লাহর পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তারা যা করতে অভ্যস্ত, তা অত্যন্ত খারাপ কাজ। কোনো মুমিনের ব্যাপারে তারা না আত্মীয়তার মর্যাদা রক্ষা করে, আর না কোনো অঙ্গীকারের ধার ধারে। আগ্রাসন ও বাড়াবাড়ি সব সময় তাদের পক্ষ থেকেই হয়ে থাকে। কাজেই যদি তারা তাওবা করে নেয় এবং সালাত কয়েম করে এবং যাকাত দেয় তা হলে তারা তোমাদের দ্বীনী ভাই। যারা জানে, তাদের জন্য আমার বিধান স্পষ্ট করে বর্ণনা করি। আর যদি অঙ্গীকার করার পর তারা নিজেদের কসম ভঙ্গ করে এবং তোমাদের দ্বীনের ওপর হামলা চালাতে থাকে তা হলে কুফরির পতাকাবাহীদের সাথে যুদ্ধ করো। কারণ তাদের কসম বিশ্বাসযোগ্য নয়। হয়তো (এরপর তরবারির ভয়েই) তারা নিরস্ত্র হবে।[১২]

এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা মুশরিকদের সাথে যে-কোনো চুক্তিকে নাকচ করে দিয়েছেন যতক্ষণ-না তারা আমাদের সামনে একেবারে সোজা হয়ে যায়। এখান থেকে জানা গেল, একজন মুশরিক তখনই কেবল নিরাপত্তা পেতে পারে যখন সে আমাদের

---

[১২] সূরা তাওবা, ৯ : ৮-১২

সামনে একদম সোজা হয়ে যাবে।

আর এটা স্পষ্ট যে, (যিম্মি যদি কটূক্তি করে, তা হলে) সে আমাদের সামনে আমাদের রব, নবী, কিতাব ও দ্বীন নিয়ে ব্যঙ্গ করে ও স্পর্ধা দেখিয়ে তার যিম্মি হয়ে থাকার বিষয়টি প্রশ্নবিদ্ধ করে ফেলে, যেমন সে যদি আমাদের বিরুদ্ধে সরাসরি যুদ্ধে জড়ায়, তা হলে তার আনুগত্যের বিষয়টা নিঃশেষ হয়ে যায়।

বরং আমরা যদি প্রকৃত মুমিন হয়ে থাকি, তা হলে (আল্লাহ ও রাসূলের শানে) কটূক্তি আমাদের নিকট আরও কঠিন ও যন্ত্রণাদায়ক হওয়ার কথা। ফলে তখন আমাদের জন্য আবশ্যক, নিজেদের জান ও মাল খরচ করা, যেন আল্লাহর দ্বীন বিজয়ী হয় এবং আমাদের ভূখণ্ডে আল্লাহ ও রাসূলের শানে কষ্টদায়ক কোনো কিছুর প্রকাশ আর না ঘটে।

উপরিউক্ত আয়াতসমূহের নিম্নোক্ত অংশ দ্বারা বিষয়টি আরও স্পষ্ট হয়—"তবে তাদের ছাড়া অন্য মুশরিকদের জন্য নিরাপত্তা-চুক্তি কেমন করে হতে পারে, যখন তাদের অবস্থা হচ্ছে এই যে, তারা তোমাদের ওপর নিয়ন্ত্রণ লাভ করতে পরলে তোমাদের ব্যাপারে কোনো আত্মীয়তার পরোয়া করবে না এবং কোনো অঙ্গীকারের দায়িত্বও নেবে না।"[১৩]

অর্থাৎ তাদের জন্য কীভাবে নিরাপত্তা-বিধান জারি থাকতে পারে? যদি তারা তোমাদের ওপর জয় লাভ করত তা হলে তারা না আত্মীয়তার পরোয়া করত, আর না কোনো প্রতিশ্রুতির প্রতি লক্ষ রাখত।

সুতরাং বোঝা গেল, যে ব্যক্তির অবস্থা হলো এই যে—যদি সে আমাদের ওপর বিজয় লাভ করে তা হলে তার মাঝে ও আমাদের মাঝে সম্পাদিত চুক্তির কোনো পরোয়াই সে করবে না, তা হলে সে যখন আমাদের দ্বীনকে নিয়ে কটূক্তি করে আমাদের সামনে স্পর্ধা দেখায়, তখন এটা দলিল হয়ে যায় যে, সে জয়লাভ করলে আমাদের সাথে চুক্তির কোনো পরোয়াই করত না। লাঞ্ছনার সাথে থেকেই যে এতটুকু করতে পারে, ক্ষমতা পেলে তা হলে অবস্থা কেমন হতে পারে? তবে যে যিম্মি এমন স্পর্ধা দেখায় না, তার কথা ভিন্ন।

---

[১৩] সূরা তাওবা, ৯ : ৮

• তৃতীয় দলিল

وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ

আর যদি অঙ্গীকার করার পর তারা নিজেদের কসম ভঙ্গ করে এবং তোমাদের দ্বীনের ওপর হামলা চালাতে থাকে তা হলে কুফরির পতাকাবাহীদের সাথে যুদ্ধ করো। কারণ তাদের কসম বিশ্বাসযোগ্য নয়। হয়তো (এরপর তরবারির ভয়েই)তারা নিরস্ত্র হবে।'[১৪]

এই আয়াতটি বেশ কয়েকভাবে প্রমাণ পেশ করে—

ক/

আয়াতে উল্লেখিত 'চুক্তিভঙ্গ' করাটাই যুদ্ধ অপরিহার্য করে তুলতে পারে। সাথে সাথে এ আয়াতে আল্লাহ طعن في الدين বা 'দ্বীন নিয়ে কটূক্তির কথাও বলেছেন, কারণ এটি কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ অপরিহার্য করে তোলার সবচেয়ে শক্তিশালী দাবি। অথবা আল্লাহ তাআলা যিম্মিদের অবস্থা স্পষ্ট করার জন্য এবং যুদ্ধের কারণ আরও সুস্পষ্টরূপে তুলে ধরার طعن في الدين বা 'দ্বীন নিয়ে কটূক্তির' কথা বলেছেন। কিংবা তিনি যুদ্ধ অপরিহার্য করেছেন নিম্নোক্ত আয়াত দুটি দ্বারা,

(فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ) অর্থাৎ 'তোমরা কাফেরদের নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো।'

فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ

'তা হলে কুফরির পতাকাবাহীদের সাথে যুদ্ধ করো।'

أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ

'তোমরা কি লড়াই করবে না এমন লোকদের সাথে যারা নিজেদের অঙ্গীকার ভঙ্গ করে এসেছে এবং যারা রাসূলকে দেশ থেকে বের করে দেবার দুরভিসন্ধি করেছিল আর বাড়াবাড়ি সূচনা তারাই করেছিল?'[১৫]

---

[১৪] সূরা তাওবা, ৯ : ১২

[১৫] সূরা তাওবা, ৯ : ১৩

তবে طعن في الدين বা 'দ্বীন নিয়ে কটূক্তি' অংশটুকু এ কথা বোঝানোর জন্য এনেছেন যে, طعن في الدين বা 'দ্বীন নিয়ে কটূক্তি যুদ্ধকে অপরিহার্য করে। কেননা যারা নিছক অঙ্গীকার বা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করবে তাদেরকেও নিরাপত্তা দেওয়া যেতে পারে, কিন্তু যারা দ্বীন নিয়ে আঘাত করবে তাদের সাথে যুদ্ধ সুনির্ধারিত। আর এটা ছিল রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সুন্নাহ—তিনি ওই সব ব্যক্তিদের রক্ত মূল্যহীন ঘোষণা করতেন, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে কষ্ট দিত এবং দ্বীন নিয়ে কটূক্তি করত।

কেউ যদি আপত্তি করে, আয়াত থেকে তো বোঝা যায়, যে ব্যক্তি দ্বীনকে নিয়ে কটূক্তি করবে এবং একই সাথে চুক্তি ভঙ্গ করবে তার বিরুদ্ধে কিতাল অপরিহার্য। কিন্তু যে ব্যক্তি শুধু আমাদের দ্বীনকে কটূক্তি করবে, আয়াতের অর্থ মোতাবেক তো তার বিরুদ্ধে কিতাল অপরিহার্য হয় না; কেননা আল্লাহ তাআলা কিতালের হুকুমকে দুটো অবস্থার সাথে সংযুক্ত করেছেন। সুতরাং দুটো অবস্থার মাত্র একটা পাওয়া গেলে তো কিতালের হুকুম আসবে না।

আমরা অভিযোগের জবাবে বলব, কোনো হুকুমকে এমন সব বৈশিষ্ট্যের সাথেই কেবল যুক্ত করা হয়, হুকুম অপরিহার্য হওয়ার ক্ষেত্রে যাদের প্রত্যেকের নিজস্ব একটি প্রভাব রয়েছে। কেননা যদি প্রভাব না-ই থাকে, তা হলে কোনো হুকুমকে সেই বৈশিষ্ট্যের সাথে সম্পৃক্ত করা সংগত হতে পারে না। কখনও কখনও (যে-সমস্ত বৈশিষ্ট্যের সাথে বিধানকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে), সে-সমস্ত বৈশিষ্ট্যের প্রত্যেকটিই হুকুম অবধারিত করার ক্ষেত্রে স্বতন্ত্রভাবে সম্পূর্ণ প্রভাব রাখে। যেমন বলা হলো—'যায়িদকে যিনা ও ইরতিদাদের কারণে হত্যা করা হবে।' (এখানে যায়িদকে হত্যার কারণ দুটো—যিনা এবং ইরতিদাদ। দুটি কারণই স্বতন্ত্রভাবে মৃত্যুদণ্ড অপরিহার্য করে। আবার দুটো কারণের একটিও যদি পাওয়া যায়, তা হলেও কতল অবধারিত হবে।)

কখনও কখনও শাস্তি একত্রে সমগ্র বৈশিষ্ট্যের ওপর আরোপিত হয়। প্রতিটি বৈশিষ্ট্য আলাদাভাবে হুকুমের ওপর আংশিক প্রভাব বিস্তার করে। যেমন কুরআনের আয়াত-

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا

'তারা আল্লাহ ছাড়া আর কোনো উপাস্যকে ডাকে না, আল্লাহ যে প্রাণকে হারাম করেছেন কোনো সংগত কারণ ছাড়া তাকে হত্যা করে না এবং ব্যভিচার করে না। এসব যে-ই করে সে তার গোনাহের শাস্তি ভোগ করবে।'[১৬]

[১৬] সূরা ফুরকান, ২৫ : ৬৮

আবার কখনও কখনও ওই সকল বৈশিষ্ট্য একটার সাথে অপরটা ওতপ্রোতভাবে সম্পৃক্ত থাকে। (অর্থাৎ উভয় গুণ বা অবস্থার একটা অস্তিত্বে আসলে দ্বিতীয়টা অনিবার্যভাবে অস্তিত্বে আসে, তেমনি দ্বিতীয়টা অস্তিত্বে আসলে প্রথমটাও অনিবার্যভাবে অস্তিত্বে আসে।) যদি এমন দুটো বৈশিষ্ট্য বা অবস্থার প্রত্যেকটাকে আলাদা করা হয় তা হলে প্রত্যেকটাই স্বতন্ত্র অথবা সম্মিলিতভাবে হুকুমের ওপর প্রভাব বিস্তার করে। এ ধরনের ক্ষেত্রে একটা বৈশিষ্ট্যই যেহেতু হুকুমের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম সেহেতু দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য বা অবস্থাকে উল্লেখ করা হয় মূলত বাক্যকে আরও মজবুত ও স্পষ্ট করার জন্য। যেমন বলা হয়— كَفَرُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ (তারা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের সাথে কুফরি করেছে) এবং عصى الله ورسوله (সে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের অবাধ্য হলো) অর্থাৎ কেউ কাফের হওয়ার জন্য যেমন শুধু আল্লাহর সাথে কুফরই যথেষ্ট, তেমনি রাসূলের সাথে কুফরি করাও তার কাফের হওয়ার জন্য যথেষ্ট। আবার উভয়টা একসাথে কেউ করলে সেও (একই রকম) কাফের হয়ে যাবে।

আবার কখনও কখনও দুটো বৈশিষ্ট্যের একটি অপরটিকে অপরিহার্য করলেও দ্বিতীয়টা প্রথমটাকে অপরিহার্য করে না। যেমন আল্লাহ তাআলার বাণী :

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ

> 'যারা আল্লাহর আয়াতগুলোর সাথে কুফরি করে এবং অন্যায়ভাবে নবীদেরকে হত্যা করে...।'[১৭]

সুতরাং উদাহরণে বর্ণিত চার প্রকারের প্রত্যেকটা বৈশিষ্ট্য বা অবস্থার মধ্যেই দলিল আছে যে, প্রত্যেকটা বৈশিষ্ট্যই হুকুমের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম। তেমনিভাবে আয়াতে বর্ণিত طعن في الدين অর্থাৎ দ্বীনকে নিয়ে হেয় ও কটূক্তি করা এবং نقض العهد অর্থাৎ চুক্তিভঙ্গ করা প্রত্যেকটাই পরবর্তী হুকুমের মধ্যে সমানভাবে প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম।

তবে যাদের অপত্তি করার, তারা সর্বোচ্চ এতটুকু আপত্তি করতে পারে যে, চুক্তি ভঙ্গকরণ মূলত চুক্তি-ভঙ্গকারীর সাথে কিতালকে বৈধ করে আর এর সাথে দ্বীন ও শরিয়তকে হেয়-কটূক্তি করলে এটা জিহাদ-কিতালকে স্বতন্ত্রভাবে ওয়াজিব করে না তবে কিতালের প্রতি গুরুত্ব বৃদ্ধি করে।

জবাবে আমরা বলব—যাদের সাথে আমাদের কোনো মুয়াহাদা বা নিরাপত্তা-চুক্তি

---

[১৭] সূরা আলি ইমরান, ৩ : ২১

নেই তারা যদি দ্বীন ও শরিয়তকে হেয়-কটূক্তি করে, তা হলে তাদের সাথে যুদ্ধ করা অপরিহার্য হয়ে ওঠে। তা হলে যাদের সাথে আমাদের নিরাপত্তা-চুক্তি আছে এবং তারা শরিয়ত ও ইসলামের প্রতি দুর্বলতা, হীনতা প্রদর্শন করতে সম্মতি প্রকাশ করেছে বরং করতে বাধ্য, তারা যদি শরিয়তকে হেয়-কটূক্তি করে, তা হলে তাদের বিরুদ্ধে কিতাল করা তো আরও বেশি অপরিহার্য।

খ/

কোনো যিম্মি প্রকাশ্যে নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কটূক্তি করল বা আল্লাহকে কটূক্তি করল অথবা ইসলামের নামে নিন্দা করল, সে মূলত নিজের নিরাপত্তা-চুক্তি ভেঙে ফেলল এবং আমাদের দ্বীনকে আঘাত করল। কেননা মুসলিমদের মধ্যে কোনো দ্বিমত নেই যে, এমন ব্যক্তিকে শাস্তি দিতে হবে এবং শায়েস্তা করতে হবে। তা হলে বুঝা গেল, তাকে তো তার কটূক্তিকে মেনে নিয়ে নিরাপত্তা প্রদান করা হয়নি। কুরআনের সুস্পষ্ট ভাষ্যমতে তাকে হত্যা করা ওয়াজিব। এই দলিলটি বেশ শক্তিশালী ও সুন্দর। কেননা স্পষ্ট হয়েছে যে, সে চুক্তি ভঙ্গ করেছে এবং ইসলামকে কটূক্তি করেছে। আর যে ব্যক্তি চুক্তি ভঙ্গ করল এবং দ্বীনকে আঘাত করল কুরআন তাকে হত্যা করা আবশ্যক বলে।

গ/

দ্বীনকে নিয়ে কটূক্তি করার অপরাধে আল্লাহ তাআলা কটূক্তিকারীদেরকে 'কুফুরির নেতা বা পতকাবাহী' বলে আখ্যায়িত করেছেন। এবং পরবর্তী অংশে নেতা হওয়ার ফলাফল বলেছেন এভাবে,

إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ

'নিঃসন্দেহে তাদের জন্য কোনো চুক্তিই অবশিষ্ট থাকবে না।'

অতএব নিরাপত্তা না থাকার বিধানের মাঝে ইসলামের নামে সকল কটূক্তিকারী ও ছিদ্রান্বেষণকারী অন্তর্ভুক্ত।

'ইমামুল কুফর' বা কাফেরের নেতা বলা হয় তাকেই, যে মানুষদেরকে কুফরের দিকে ডাকে। আর সে কুফরির নেতা হয়েছে আমাদের দ্বীনকে কটূক্তি করে ও মানুষকে কুফরের দিকে আহ্বানের মাধ্যমে। আর নেতাদের কাজই তো এটা। সুতরাং যারাই

আমাদের দ্বীনকে নিয়ে কটূক্তি করবে তারাই কাফেরদের ইমাম বা নেতা বলে বিবেচিত হবে। ফলে তাদের সাথে যুদ্ধ করাও আবশ্যক হবে।আল্লাহ যেমন বলেন—

فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ

'তোমরা কুফরের নেতাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো।'[১৮]

ঘ/

আল্লাহ তাআলা বলেন,

أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَءُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ

'তোমরা ওই সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে কেন লড়াই করছ না, যারা তোমাদের সাথে কৃত চুক্তিনামা ভঙ্গ করেছে ও রাসূলকে বের করে দেওয়ার ফন্দি এঁটেছে এবং তারাই তোমাদের সাথে প্রথম যুদ্ধ শুরু করেছে।'[১৯]

রাসূলকে বের করে দেওয়ার ফন্দি আটাকে আল্লাহ তাআলা যুদ্ধের উস্কানি হিসেবে দেখিয়েছেন; কেননা এই ফন্দি আঁটাও রাসূলকে এক প্রকার কষ্ট দেওয়া। তা হলে রাসূলকে গালমন্দ করা তো তাঁকে বের করে দেওয়ার চেয়েও বেশি জঘন্য ও কষ্টদায়ক ব্যাপার। কারণ যারা পূর্বে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বের করে দেবার পরিকল্পনা করেছিল, মক্কা বিজয়ের দিন নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন, কিন্তু যারা তার কটূক্তি করেছিল, তিনি তাদেরকে ক্ষমা করেননি।

ঙ/

আল্লাহ তাআলা বলেন,

قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ

'তোমরা কি লড়াই করবে না এমন লোকদের সাথে, যারা নিজেদের

[১৮] সূরা তাওবা, ৯ : ১২

[১৯] সূরা তাওবা, ৯ : ১৩

অঙ্গীকার ভঙ্গ করে এসেছে এবং যারা রাসূলকে দেশ থেকে বের করে দেবার দুরভিসন্ধি করেছিল আর বাড়াবাড়ি সূচনা তারাই করেছিল?'[২০]

আল্লাহ তাআলা এ আয়াতে সে-সকল লোকদের সাথে যুদ্ধ করার নির্দেশ দিচ্ছেন, যারা চুক্তি ভঙ্গ করেছে এবং দ্বীনকে নিয়ে কটূক্তি করেছে। অপরদিকে আল্লাহ মুমিনদেরকে নিশ্চয়তা দিচ্ছেন যে, তারা যদি তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে তা হলে আল্লাহ তাআলা তাদের হাত দিয়েই কাফেরদেরকে শাস্তি দিবেন, লাঞ্ছিত করবেন, তাদেরকে কাফেরদের বিরুদ্ধে সাহায্য করবেন; আর কাফেরদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের কারণে মুমিনগণ যে ব্যথিত হয়েছে—তাদের অন্তরকে প্রশমিত করবেন, তাদের ক্ষোভ নিবারিত করবেন। উপরিউক্ত আয়াত প্রমাণ করে যে, চুক্তি-ভঙ্গকারী ও দ্বীনকে নিয়ে কটূক্তিকারী এসব শাস্তির উপযুক্ত হবে। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে গালমন্দকারীও নিশ্চয়ই চুক্তি-ভঙ্গকারী ও দ্বীনকে নিয়ে কটূক্তিকারী হিসেবে হত্যার উপযুক্ত।

চ/

আল্লাহ তাআলা বলেন,

أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَّكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُم بَدَءُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ ۚ أَتَخْشَوْنَهُمْ ۚ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿١٣﴾ قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ ﴿١٤﴾

'তাদের সাথে লড়াই করো,আল্লাহ তোমাদের হাতে তাদের শাস্তি দেবেন, তাদেরকে লাঞ্ছিত ও অপদস্থ করবেন, তাদের মোকাবিলায় তোমাদের সাহায্য করবেন এবং অনেক মুমিনের অন্তর শীতল করে দেবেন। আর তাদের অন্তরের জ্বালা জুড়িয়ে দেবেন। এবং যাকে ইচ্ছা তাওবা করার তাওফীকও দান করবেন। আল্লাহ সবকিছু জানেন এবং তিনি মহাজ্ঞানী।'[২১]

আল্লাহ তাআলা কেন লড়াইয়ের নির্দেশ দিয়েছেন, এ আয়াত সেই উদ্দেশ্য যেন বলে দিচ্ছে। আর তা হলো কাফেরদের চুক্তি ভঙ্গ-করা ও দ্বীন নিয়ে কটূক্তি করার ফলে মুমিনদের অন্তর যে কষ্ট পেয়েছে, সে কষ্ট উপশম করা। কারণ যে ব্যক্তি রাসূল

---

[২০] সূরা তাওবা, ৯ : ১৪

[২১] সূরা তাওবা, ৯ : ১৪-১৫

সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কটূক্তি করল, সে মুমিনদেরকে এ পরিমাণ ক্ষেপিয়ে তুলল এবং এ পরিমাণ কষ্ট দিল, মুসলিমদের রক্ত ঝরালেও এবং তাদের ধন-সম্পদ ছিনিয়ে নিলেও তারা কখনও এতটা কষ্ট ও ক্ষোভ অনুভব করবে না। কেননা এ রাগ ও ক্ষোভ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ভালোবাসায়।[২২]

• চতুর্থ দলিল

أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ذَٰلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ

তারা কি জানে না যে, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে শত্রুতা করবে, তার জন্য জাহান্নামের আগুন, যেখানে সে চিরকাল থাকবে আর সেটাই বিরাট লাঞ্ছনা।[২৩]

এ আয়াত প্রমাণ করে যে, নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কষ্ট দেওয়া মানে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে শত্রুতা করা। কেননা আল্লাহ তাআলা আয়াতটিকে এনেছেন এই আয়াতের পরে—

وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ

তাদের মধ্যে কিছু লোক আছে যারা রাসূলকে কষ্ট দেয়।

এই আয়াতের নাযিলকালীন প্রেক্ষাপট ছিল—নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পক্ষ থেকে ওই সকল মুনাফিক ও মুশরিকদের প্রতি ভর্ৎসনা করা, যারা নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে গালমন্দ, কটূক্তি বা তুচ্ছতাচ্ছিল্যপূর্বক কষ্ট দিত।

পঞ্চম দলিল

إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا

'যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে কষ্ট দেয় আল্লাহ দুনিয়া ও আখিরাতে তাদেরকে অভিশপ্ত বানিয়েছেন।'[২৪]

---

[২২] কটূক্তিকারীকে হত্যা করা ছাড়া মুমিনের এ রাগ প্রশমিত হয় না।

[২৩] সূরা তাওবা, ৯ : ৬৩

[২৪] সূরা আহযাব, ৩৩ : ৫৭

প্রথম

মাসআলা

যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে কষ্ট দেয়, এ আয়াত অনুযায়ী তাদেরকে হত্যা করা ওয়াজিব। আর আমরা তো তাদের সাথে নিরাপত্তা-চুক্তি এই শর্তে করিনি যে, তারা আল্লাহ ও তার রাসূলকে কষ্ট দিতে পারবে।

বিষয়টি আরও বেশি স্পষ্ট হয় এই হাদীসটির সুস্পষ্ট বর্ণনা দ্বারা—

مَنْ لِكَعْبِ بْنِ الأَشْرَفِ فَإِنَّهُ قَدْ آذَى اللهَ وَرَسُولَهُ

'কে আছ কাব ইবনে আশরাফের (শায়েস্তার) জন্য? কেননা সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে কষ্ট দিয়েছে।'[২৫]

[২৫] বুখারী, আস-সহীহ : ৩৮১১, মুসলিম, আস-সহীহ : ৪৭৬৫। সামনে এ হাদীসের বিস্তারিত আলোচনা আসছে, ইন-শা-আল্লাহ।

শাতিম যদি ইসলামের অনুসারী হয়

আল্লাহর রাসূলকে নিয়ে কটূক্তিকারী যদি মুয়াহিদ বা চুক্তিবদ্ধ না হয়ে ইসলামের অনুসারী হয়, তা হলে তাকে হত্যার অসংখ্য দলিল তো আছেই, সাথে সাথে মুসলিমদের ইজমাও রয়েছে।

- **প্রথম দলিল**

আল্লাহ তাআলা বলেন,

> وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ...... وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ
>
> 'তাদের মধ্যে এমন কিছু লোক রয়েছে, যারা নবীকে কষ্ট দেয় আর বলে, সে সব শোনে...! যারা আল্লাহর রাসূলকে কষ্ট দেয় তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।'

তারপর আল্লাহ তাআলা বলেন,

> أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ذَٰلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ
>
> 'তারা কি জানে না, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে বিদ্বেষ-পোষণ করবে, তার জন্য রয়েছে জাহান্নাম। সেখানে সে অবস্থান করবে চিরকাল। এটা তো মহা লাঞ্ছনা।'[২৬]

---

[২৬] সূরা তাওবা, ৯ : ৬১-৬৩

উপরিউক্ত আয়াতগুলো থেকে স্পষ্ট হয়ে উঠল যে, আল্লাহর রাসূলকে কষ্ট দেওয়ার মানে হলো আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে বিরুদ্ধাচরণ করা। কেননা إيذاء (কষ্ট দেওয়া-)র পরিণাম বা দাবি হিসাবেই আল্লাহ পরবর্তীকালে محادة (বিরুদ্ধাচরণ করা) শব্দ এনেছেন। সুতরাং আল্লাহকে কষ্ট দেওয়া অবশ্যই তার বিরুদ্ধাচরণের শামিল। সুতরাং এখান থেকে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহর রাসূলকে কষ্ট দেওয়া ও তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করা—উভয়টিই কুফরি। কেননা আল্লাহ তাআলা (এখানে) জানিয়েছেন, যে ব্যক্তি রাসূলকে কষ্ট দিবে এবং তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করবে সে চিরকাল জাহান্নামে থাকবে; বরং রাসূলের বিরুদ্ধাচরণের মাঝে তো তাঁর সাথে শত্রুতা করা ও যুদ্ধ ঘোষণার অর্থও নিহিত রয়েছে। আর রাসূলের সাথে শত্রুতা হলো কুফর এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার নামান্তর। তাই রাসূলকে কষ্টদানকারী অভিশপ্ত ব্যক্তি জঘন্য কাফের, আল্লাহর দুশমন এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধকারী।

হাদীসে আছে, এক ব্যক্তি রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কটূক্তি করত, ফলে নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন, 'কে আছে এমন—আমার হয়ে আমার শত্রুর জন্য যথেষ্ট হবে?'[২৭]

আল্লাহ তাআলা বলেন,

لا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللهَ وَرَسُولَهُ

> 'তোমরা কখনেও এমন দেখতে পাবে না যে, যারা আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি ঈমান পোষণ করে তারা এমন লোকদের ভালোবাসছে যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরোধিতা করেছে।'[২৮]

আয়াতের ভাষ্যানুযায়ী, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে বিদ্বেষকারীদের সাথে সম্পর্ক স্থাপনকারী ব্যক্তিই মুমিন নয়। তা হলে স্বয়ং বিরোধী কী করে মুমিন হয়?

বলা হয়, আয়াতটি নাযিলকালীন প্রেক্ষাপট হলো—একবার আবু কুহাফা নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে গালি দিয়েছিল। ফলে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু

---

[২৭] ইকরিমা বর্ণনা করেন—এক মুশরিক ছিল, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিয়ে কটূক্তি করত। তো একদিন নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'কে আছ, আমার পক্ষ থেকে আমার শত্রুকে ঘায়েল করবে?' তখন যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, 'আমি প্রস্তুত ইয়া রাসূলাল্লাহ!' এরপর তিনি বেরিয়ে পড়লেন এবং তাকে হত্যা করে গনিমতের মাল-সহ ফিরে এলেন। [সানয়ানি, আল-মুসান্নাফ : ৯৪৭৭; সুয়ুতি, জামিউল আহাদীস : ৩৮৬৪২]

[২৮] সূরা মুজাদালাহ, ৫৮ : ২২

তাকে হত্যা করতে চাইলেন।[২৯]

সুতরাং বুঝা গেল, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি বিদ্বেষ-পোষণকারী হত্যাযোগ্য কাফের।

• দ্বিতীয় দলিল

আল্লাহ তাআলা বলেন,

> يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ قُلِ اسْتَهْزِئُوا إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ مَا تَحْذَرُونَ ۝ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ ۝ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ
>
> এ মুনাফিকরা ভয় করেছে, মুসলমানদের ওপর এমন একটি সূরা নাযিল হয়ে যায় কিনা, যা তাদের মনের গোপন কথা প্রকাশ করে দেবে। হে নবী! তাদের বলে দাও, “ঠাট্টা করতেই থাকো, তবে তোমরা যে জিনিসটির প্রকাশ হয়ে যাওয়ার ভয় করছে, আল্লাহ তা প্রকাশ করে দেবেন।” যদি তাদের জিজ্ঞেস করো, তোমারা কী কথা বলছিলে? তা হলে তারা ঝটপট বলে দেবে, আমরা তো হাসি-তামাশা ও পরিহাস করছিলাম। তাদের বলো, তোমাদের হাসি-তামাশা কি আল্লাহ, তাঁর আয়াত ও তাঁর রাসূলের সাথে ছিল? এখন আর ওযর পেশ করো না। তোমরা ঈমান আনার পর কুফরি করেছ।[৩০]

এই আয়াত স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, আল্লাহ তাআলাকে, তার আয়াতসমূহকে কিংবা তার রাসূলকে নিয়ে বিদ্রূপ করা সুস্পষ্ট কুফরি। এখান থেকে আমরা বুঝতে পারলাম যে, নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিয়ে বিদ্রূপকারী—চাই সত্যি সত্যি বিদ্রূপ করুক কিংবা কটূক্তির উদ্দেশ্য ছাড়াই বিদ্রূপ করুক—সে সুস্পষ্ট কুফরিতে লিপ্ত।

• তৃতীয় দলিল

[২৯] ওয়াহিদি, আসবাবুন নুযুল, পৃ. ৪৭৮

[৩০] সূরা তাওবা, ৯ : ৬৪-৬৬

আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ

'তাদের মধ্যে কিছু লোক আছে, যারা সাদাকা (বণ্টনের) ব্যাপারে আপনাকে দোষারোপ করে...।'[৩১]

আরবি لمز শব্দের অর্থ হলো দোষারোপ করা ও কলঙ্কলেপন করা।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ

'তাদের মধ্যে কিছু লোক রয়েছে, যারা নবীকে কষ্ট দেয়...।'[৩২]

এ আয়াত থেকে এ কথা স্পষ্ট যে, যারাই নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিয়ে কটাক্ষ করবে, কষ্ট দিবে তারা 'তাদের'ই অন্তর্ভুক্ত হবে। যেহেতু আল্লাহ তাআলা জানিয়ে দিচ্ছেন, যারা নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে গালমন্দ করে বা কষ্ট দেয় তারা মুনাফিকদের অন্তর্ভুক্ত, সেহেতু প্রমাণ হয়ে গেল যে, এই সব কাজ সত্যিই নিফাক।

• চতুর্থ দলিল

আল্লাহ তাআলা বলেন,

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

'না, হে মুহাম্মদ! তোমার রবের কসম! এরা কখনও মুনিন হতে পারে না—যতক্ষণ এদের পারস্পরিক মতবিরোধের ক্ষেত্রে এরা তোমাকে ফয়সালাকারী হিসেবে মেনে না নেবে, তারপর তুমি যা ফয়সালা করবে তার ব্যাপারে নিজেদের মনের মধ্যে কোনো প্রকার কুণ্ঠা ও দ্বিধার স্থান দেবে না,

---

[৩১] সূরা তাওবা, ৯ : ৫৮

[৩২] সূরা তাওবা, ৯ : ৬১

বরং সর্বান্তকরণে মেনে নেবে।'[৩৩]

আল্লাহ স্বয়ং নিজের কসম করে বলছেন, তারা মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না তারা নিজেদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদে নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বিচারক না মানে এবং যতক্ষণ না তারা রাসূলের ফয়সালায় নিজেদের মাঝে কোনো সংকীর্ণতা অনুভব না করে বরং যতক্ষণ না তারা বাহিরে ও ভিতরে রাসূলের ফয়সালার সামনে নিজেকে সপে দেয়।

উপরিউক্ত আয়াতটির পূর্বে আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا ۝ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا

'হে নবী! তুমি কি তাদেরকে দেখোনি, যারা এই মর্মে দাবি করে চলেছে যে, তারা ঈমান এনেছে সেই কিতাবের প্রতি যা তোমার ওপর নাযিল করা হয়েছে এবং সেই সব কিতাবের প্রতি যেগুলো তোমার পূর্বে নাযিল করা হয়েছিল; কিন্তু তারা নিজেদের বিষয়সমূহ ফয়সালা করার জন্য তাগুতের দিকে ফিরতে চায়, অথচ তাদেরকে তাগুত অস্বীকার করার হুকুম দেওয়া হয়েছিল? শয়তান চায় তাদেরকে ভ্রষ্ট করে বহু দূর নিতে চায়। আর যখন তাদেরকে বলা হয়, এসো সেই জিনিসের দিকে, যা আল্লাহ নাযিল করেছেন এবং এসো রাসূলের দিকে, তখন তোমরা দেখতে পাও ওই সব মুনাফিকরা তোমাদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছে।'[৩৪]

আল্লাহ তাআলা এখানে স্পষ্ট করে দিয়েছেন, যে ব্যক্তিকে কিতাবুল্লাহ ও রাসূলুল্লাহর কাছে বিচার আনার আহ্বান করা হয়, তারপরও সে রাসূলুল্লাহ থেকে ফিরে যায় সে মুনাফিক। এখানে মহামহিম আল্লাহর আরেকটি বাণী উল্লেখ করা যায়-

إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا

[৩৩] সূরা নিসা, ৪ : ৬৫

[৩৪] সূরা নিসা, ৪ : ৬০-৬১

'মুমিনদের কাজই হচ্ছে, যখন তাদেরকে আল্লাহ ও রাসূলের দিকে ডাকা হয়, যাতে রাসূল তাদের মোকদ্দমার ফয়সালা করেন, তখন তারা বলেন, আমরা শুনলাম ও মেনে নিলাম।'[৩৫]

সুতরাং যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আনুগত্য না করে তার বিচার থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়—সে মুমিন নয়, মুনাফিক। কেননা মুমিন তো ওই ব্যক্তি যে বলে আমরা শুনলাম এবং মানলাম।

যদি নিছক রাসূলের হুকুম থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার কারণে মুনাফিক হতে হয় তা হলে রাসূলের মানহানি করা এবং তাকে কটূক্তি করার হুকুম কী হতে পারে?

• পঞ্চম দলিল

আল্লাহ তাআলা বলেন,

إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا

যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে কষ্ট দেয় আল্লাহ তাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতে অভিশাপ দেন আর তাদের জন্য রয়েছে অপমানকর শাস্তি।[৩৬]

(এই আয়াতে) আল্লাহ তাআলা নিজের 'কষ্ট' ও রাসূলের কষ্ট একই সাথে সম্পৃক্ত করেছেন, যেভাবে আল্লাহ (অন্যত্র) রাসূলের আনুগত্যের সাথে নিজের আনুগত্যকে সম্পৃক্ত করেছেন। সুতরাং যে ব্যক্তি নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কষ্ট দিল, সে আল্লাহকেই কষ্ট দিল। এ বিষয়ে রাসূলের সুস্পষ্ট বর্ণনাও আছে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলাকে কষ্ট দিল সে কাফের এবং তার রক্ত হালাল।

আল্লাহকে ও তাঁর রাসূলের ভালোবাসা, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সন্তুষ্টি, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য—(এসব দুই দুইকে) আল্লাহ একই জিনিস বলে গণ্য করেছেন। সুতরাং আরও স্পষ্ট হয়ে যায় যে, রাসূলকে কষ্ট দেওয়া মানে আল্লাহকে কষ্ট দেওয়া। তেমনি আল্লাহ এসবকেও একই বিষয় বলেছেন—

আল্লাহর সাথে বৈরিতা ও রাসূলের সাথে বৈরিতা,

আল্লাহর সাথে বিরোধ ও রাসূলের সাথে বিরোধ,

---

[৩৫] সূরা নূর, ২৪ : ৫১

[৩৬] সূরা আহযাব, ৩৩ : ৫৭

আল্লাহকে কষ্টদান আর রাসূলকে কষ্টদান,

আল্লাহ তাআলার অবাধ্য হওয়া আর রাসূলের অবাধ্য হওয়া।

এখানে আল্লাহর হক আর রাসূলের হক অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত থাকবার বিষয়টা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কেননা আল্লাহর পক্ষাবলম্বন করা আর রাসূলের পক্ষাবলম্বন করা একই। সুতরাং যে ব্যক্তি রাসূলকে কষ্ট দিল, সে আল্লাহকেই কষ্ট দিল। আর যে ব্যক্তি রাসূলের আনুগত্য করল সে আল্লাহ তাআলারই আনুগত্য করল। কেননা রাসূল হলেন আল্লাহ তাআলা ও মাখলুকের মাঝে মেলবন্ধনকারী। কারও জন্য রাসূলের পথ ছাড়া ভিন্ন কোনো পথ নেই। আল্লাহ তাআলা নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাঁর আদেশ-নিষেধ, সংবাদ-প্রদান ও বিধান বর্ণনার ক্ষেত্রে নিজের প্রতিনিধি নিযুক্ত করেছেন। সুতরাং এ-সমস্ত ক্ষেত্রে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণের মাঝে পার্থক্য করা ঠিক হবে না।

অথচ কুরআনে আল্লাহ ও রাসূলগণকে কষ্ট দেওয়া আর অন্যান্য মুমিন নারী-পুরুষকে কষ্ট দেওয়া এক কথা নয়। আল্লাহ তাআলা মুমিন নর-নারীকে কষ্ট দেওয়াটাকে বুহতান বা অন্যায় অপবাদ হিসেবে উল্লেখ করেছেন এবং ভয়াবহ গুনাহের কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে কষ্ট দেয়, তাকে তিনি দুনিয়া ও আখিরাতে অভিশপ্ত হিসেবে ঘোষণা করেছেন এবং তার জন্য লাঞ্ছনাকর শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন।

আমরা তো জানি যে, মুমিনদেরকে কষ্ট দেওয়া কবীরাহ গুনাহ, এর শাস্তি কখনও কখনও বেত্রাঘাত হয়ে থাকে। আর এ কবিরা গুনাহের চেয়ে বড় গুনাহ হলো কুফরি ও হত্যা। (সুতরাং আল্লাহ ও রাসূলকে কষ্ট দেওয়াটা আরও গুরুতর হওয়ায় তা কুফরি হবে।)

তা ছাড়া আল্লাহ তাআলা তাদের ওপরে লানত করেছেন। লানতের অর্থ হলো আল্লাহর রহমত থেকে বিতাড়িত করা। আর দুনিয়া ও আখিরাতে আল্লাহর রহমত থেকে কাফের ছাড়া কাউকে বিতাড়িত করা হয় না। সুতরাং এমন অভিশপ্তের রক্তের কোনো মূল্য নেই, বরং তার রক্ত বৈধ। কেননা কোনো ব্যক্তির রক্তকে নিরাপত্তা-প্রদান করা বা হারাম করা আল্লাহর বড় রহমত ও অনুগ্রহের অন্তর্ভুক্ত। এই হুকুমের সমর্থনে আরেকটি আয়াত আছে—

مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِيلًا

'(তারা) অভিশপ্ত। তাদেরকে যেখানেই পাওয়া যাবে পাকড়াও করা হবে এবং দৃষ্টান্তমূলকভাবে হত্যা করা হবে।'[৩৭]

এই আয়াতের ভাষ্য উল্লিখিত হুকুমটিকে আরও স্পষ্ট করে যে, আল্লাহ তাআলা তার কিতাবে যাদেরকেই অভিসম্পাত করেছেন তারা হয়তো কাফের, নয়তো তাদের রক্ত মূল্যহীন। তবে কেউ যদি আপত্তি করে এই আয়াতের মাধ্যমে তা রদ করে দেবার কসরত করে—

إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

যারা সতী-সাধ্বী, সরলমনা মুমিন মহিলাদের প্রতি অপবাদ দেয় তারা দুনিয়ায় ও আখেরাতে অভিশপ্ত এবং তাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি।[৩৮]

এই আয়াতে অপবাদদাতাকে দুনিয়া ও আখিরাতে অভিসম্পাত করা হলেও অপবাদ দেওয়া কুফরি নয়।

এ আপত্তির জবাব কয়েকভাবে হতে পারে।

✓ প্রথম জবাব

এই আয়াতটি আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার ব্যাপারে নাযিল হয়েছে। এমনটাই বর্ণনা করেছেন ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা-সহ অন্যান্য মুফাসসিরগণ। আর আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে অপবাদ দেওয়ার মানে হলো আল্লাহর নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কষ্ট দেওয়া ও কলঙ্কিত করা। কেননা স্ত্রী ব্যভিচার করবে বা স্ত্রীকে ব্যভিচারের অপবাদ দেওয়া হবে, এটা নিশ্চয় স্বামীর জন্য কষ্টদায়ক।

এ জন্যই ইমাম আহমাদ রাহিমাহুল্লাহ মত দিয়েছেন যে, যদি কেউ কোনো 'গাইরে মুহসিন' নারী যেমন বাদী বা আহলে কিতাব যিম্মিকে অপবাদ দেয়, আর সেই নারীর মুসলিম বা স্বাধীন স্বামী থাকে অথবা মুসলিম বা স্বাধীন কোনো সন্তান থাকে, তা হলে এমন অপবাদদানকারীর ওপর 'হদ্দে কযফ' বা মিথ্যা অপবাদের সাজা প্রয়োগ করা হবে। কেননা এমন অপবাদ সেই স্বামী বা সন্তানকেও আঘাত করে।

---

[৩৭] সূরা আহযাব, ৩৩ : ৬১

[৩৮] সূরা নুর, ২৪ : ২৩

সুতরাং এই আয়াতটি শুধুমাত্র ওই সব ব্যক্তির জন্যই প্রযোজ্য, যারা উম্মাহাতুল মুমিনিন তথা নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর স্ত্রীদের ওপর মিথ্যা অপবাদ দেয়। কেননা যে ব্যক্তি নবীজির স্ত্রীদেরকে অপবাদ দেয়, সে মূলত নবীজির দোষ বলতে চায়। নিঃসন্দেহে এমন ব্যক্তি মুনাফিক।

এ ছাড়া কেউ যদি কোনো মুসলিম নারীকে অপবাদ দেয়, তা হলে সে হবে ফাসিক। কেননা (এ ব্যক্তির ক্ষেত্রে) আল্লাহ তাআলা বলেন, او يتوب। (কিংবা যদি সে তাওবা করে) অর্থাৎ তাওবা করলে আল্লাহ ক্ষমা করে দিবেন।

(উপরিউক্ত ব্যাখ্যা অনুযায়ী) আয়াতে ('সতী' নারী বোঝাতে) 'মুহসানাত' শব্দের শুরুতে যে আলিফ-লাম আছে; সেটা নির্দিষ্টতা বোঝানোর জন্য। ফলে নির্দিষ্ট কতিপয় সতী নারীই এখানে উদ্দেশ্য। এ প্রকার আলিফ-লামকে 'আল-লামু লিল আহদিয়া' বলা হয়। আর তাঁরা হলেন নবীজির স্ত্রীগণ। কেননা আয়াতের মধ্যে আলোচনা চলছিল ইফ্ক[৩৯] এর ঘটনা নিয়ে। অথবা আয়াতের মধ্যে মুহসানাত শব্দটি[৪০] ব্যাপক অর্থবোধক হলেও নাযিলকালীন প্রেক্ষাপটের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে। আয়াতটি প্রেক্ষাপটের সাথে সীমাবদ্ধকরণের শক্তিশালী দলিল আছে। কেননা নবীপত্নীগণের ঈমান স্বীকৃতি-প্রাপ্ত; তারা মুমিনদের মা এবং দুনিয়া ও আখিরাতে নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর স্ত্রী। তা ছাড়া আল্লাহ তাআলা (উক্ত আয়াতের শেষাংশে) বলেন,

وَالَّذِى تَوَلَّى كِبْرَهُۥ مِنْهُمْ لَهُۥ عَذَابٌ عَظِيمٌ

> তাদের মধ্যে যে অপবাদ দেওয়ায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে, তার জন্যে রয়েছে বিরাট শাস্তি।[৪১]

আয়াতটি থেকে জানা গেল, যে ব্যক্তি উম্মুল মুমিনীনদেরকে অপবাদ দেয়, সে মূলত নবীজির কটূক্তি করে এবং গুরুতর অপবাদের ভূমিকা পালন করে। এটি ছিল ইবনে উবাইয়ের বৈশিষ্ট। সুতরাং উম্মুল মুমিনীনদেরকে অপবাদ দেওয়ার উদ্দেশ্য যদি হয় নবীজিকে কষ্ট দেওয়া, তবে তা এমন নেফাক যা অপবাদদানকারীর রক্ত প্রবাহকে হালাল করে দেয়। 'উম্মুল মুমিনীনগণ আখিরাতেও নবীজির স্ত্রী হিসেবে থাকবেন'—

---

[৩৯] ইফক—আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর ওপর মুনাফিকদের-দেওয়া যিনার মিথ্যা অপবাদের ঘটনা।

[৪০] আলিফ-লাম যদি লিল-জিনস বা সামগ্রিকতা বোঝানোর জন্য। আরবী ভাষায় আলিফ-লাম আরও একাধিক অর্থেও এসে থাকে।

[৪১] সূরা নূর, ২৪ : ১১

এটা জানার পরও যদি কেউ তাদেরকে অপবাদ দিয়ে কষ্ট দেয় তা হলে সে মুনাফিক, তার রক্ত হালাল। কেননা কোনো নবীর স্ত্রী কখনোই ব্যভিচার করেননি।

এ জন্যই বুখারী ও মুসলিমের এক হাদীসে নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

مَنْ يَعْذِرُنِي مِنْ رَجُلٍ قَدْ بَلَغَ أَذَاهُ فِي أَهْلِ بَيْتِي فَوَاللهِ مَا عَلِمْتُ عَلَى أَهْلِي إِلاَّ خَيْرًا...

'কে আছে, যে আমাকে এমন ব্যক্তি থেকে চিন্তামুক্ত করবে, যে কিনা আমার পরিবারকে পর্যন্ত কষ্ট দেয়। আল্লাহর শপথ! আমি আমার পরিবার সম্পর্কে সবকিছু ভালোই জানি।'

এ কথার জবাবে সাদ ইবনে মুআয রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন,

أَنَا أَعْذِرُكَ مِنْهُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنْ كَانَ مِنَ الأَوْسِ ضَرَبْنَا عُنُقَهُ

'আমি আপনাকে তার বিষয়ে চিন্তামুক্ত করব। যদি সে আউস গোত্রের লোক হয় তা হলে আমি তার গর্দান উড়িয়ে দিব।'[৪২]

আল্লাহর নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাদ বিন মুয়ায রাদিয়াল্লাহু আনহু-কর্তৃক অপরাধীদের গর্দান উড়িয়ে দেওয়ার অনুমতি-প্রার্থনাকে অস্বীকৃতি জানাননি। আবার এ হত্যার বিধানে মিসতাহ, হাসসান ও হামনাহ কেউই অন্তর্ভুক্ত হবে না, যদিও তারা ইফকের ঘটনায় জড়িত ছিলেন। কেননা তাদের ওপর নিফাকের হুকুম দেওয়া হয়নি, এমনকি নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে এ জন্য হত্যাও করেননি, বরং তাদেরকে বেত্রাঘাত করার ঘটনাটাও মতবিরোধপূর্ণ। কেননা তারা নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কষ্ট দিতে চাননি এবং তাদের থেকে ইচ্ছাকৃতভাবে কষ্ট দেওয়ার আলামতও প্রকাশ পায়নি। তবে মুনাফিক ইবনে উবাইয়ের বিষয়টা ছিল ভিন্ন। তার উদ্দেশ্যই ছিল নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কষ্ট দেওয়া।

তা ছাড়া তাদের নিকট বিষয়টা তখনও স্পষ্ট ছিল না যে, দুনিয়াতে যারা নবীজির স্ত্রী, তারাই আখিরাতে তার স্ত্রী হবেন। আর যারা রাসূলের প্রকৃত স্ত্রী তারা ব্যভিচার করবে, এটা তাদের বিবেকের কাছেও ছিল অসম্ভব। তাই নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ ঘটনায় সিদ্ধান্ত নেওয়ার বিষয়ে বিরত থেকেছেন।

---

[৪২] বুখারী, আস-সহীহ : ৩৯১০; মুসলিম, আস-সহীহ : ৭১৯৬

✓ দ্বিতীয় জবাব

উল্লিখিত আয়াতের হুকুমটি ব্যাপকও হতে পারে। অর্থাৎ হুকুমটি কেবল নবীপত্নীদের সাথেই সীমাবদ্ধ নয় বরং সকল মুসলিম নারীই উক্ত আয়াতের অন্তর্ভুক্ত। একাধিক রেওয়ায়াতে বর্ণিত হয়েছে যে, সতী-সাধ্বী নারীদেরকে অপবাদ দেওয়া কবিরাহ গুনাহ।[৪৩]

বলা হয়, আয়াতটি নাজিল হয়েছিল মক্কার মুশরিকদের সম্পর্কে।[৪৪] কোনো মুসলিম নারী যখন হিজরত করে নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট আসতেন তখন তারা মুমিন নারীদেরকে অপবাদ দিত এবং (অপবাদ দিয়ে) নারীদেরকেও ঈমান-আনয়ন থেকে বিরত রাখত এবং তারা ইসলামকে মানুষের সামনে ঘৃণিত করার জন্য মুমিনদের নিন্দা করত। যেমনটা ইহুদি কবি কাব ইবনে আশরাফ করত।

উপরিউক্ত আয়াতের এ ব্যাখ্যা অনুযায়ী বলা যায়, যারা এমন কটূক্তি করবে সেও কাফের। রাসূলকে কটূক্তির যে বিধান, এ ব্যক্তির একই বিধান।

আবার এও বলা হয়ে থাকে যে, আয়াতটি সর্বদিক থেকেই ব্যাপক অর্থবোধক। অর্থাৎ আয়াতটি যেভাবে নবীপত্নীদের সাথে সীমাবদ্ধ না হয়ে সমগ্র মুসলিম নারীদের জন্য প্রযোজ্য, তেমনিভাবে (তখনকার) মক্কার অপবাদদানকারী মুশরিকদের সাথে সীমাবদ্ধ না হয়ে যে-কোনো অপবাদদাতার বেলায়ও প্রযোজ্য হবে। তবে পূর্বে যে আয়াত উল্লেখ করা হয়েছে—'যারা সতী সরল মুমিন নারীদেরকে অপবাদ দিবে তাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতে অভিশাপ দেওয়া হবে আর তাদের জন্য রয়েছে বিরাট আযাব।'[৪৫]

এখানে 'তাদেরকে অভিশাপ করা হবে' বোঝাতে لُعِنُوا ক্রিয়া ব্যবহৃত হয়েছে, কে অভিশাপ করবে সেটা বলা হয়নি। তাই সম্ভবনা আছে যে, লানতকারী আল্লাহ নাও হতে পারেন, বরং কোনো মাখলুক হবে। অর্থাৎ লানতকারী ফেরেশতা ও মানুষজাতি হওয়ারও সম্ভাবনা আছে। তেমনি এও হতে পারে, লানতকারী আল্লাহ-ই, তবে তিনি সব সময় অপবাদদানকারীদেরকে লানত করেন না। কখনও কখনও তিনি শুধুমাত্র কিছু অপবাদদাতাকে লানত করেন আবার কখনও কখনও মাখলুকও অভিশাপদাতাদেরকে

---

[৪৩] যেমন একদা রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'তোমরা ৭টি ধ্বংসাত্মক বিষয় থেকে বেঁচে থাকো।' সাহাবাগণ প্রশ্ন করলেন, 'সেগুলো কী, ইয়া রাসূলাল্লাহ?' তিনি বললেন, 'সেগুলো হলো—১. আল্লাহর সাথে শিরক করা, ২. জাদু করা, ৩. অন্যায়ভাবে কোনো মানুষকে হত্যা করা, ৪. সুদ খাওয়া, ৫. এতিমের মাল আত্মসাৎ করা, ৬. যুদ্ধের ময়দান থেকে পলায়ন করা, ৭. অবলা সরলা কোনো সতীসাধ্বী মুমিন নারীর ওপর যিনার অপবাদ দেয়া।' [বুখারী, আস-সহীহ : ২৭৬৬; মুসলিম, আস-সহীহ : ২৭২]

[৪৪] এটি বিশিষ্ট তাবেয়ী আবু হামযাহ আস-সুমালি রাহিমাহুল্লাহ-এর মত।

[৪৫] সূরা নূর, ২৪ : ২৩

লানত করে।

আল্লাহ তাআলা শুধু ওই সব লোকদেরকেই লানত করেন, যারা দ্বীনকে আক্রমণ করে কথা বলে। 'মাখলুক লানত করে' কথাটির অর্থ হলো একে অপরের জন্য বদদুয়া করে বা একে অপরের ওপর আল্লাহর লানত নাযিল হওয়ার দুআ করে।

মাখলুকের লানত করা মানে যে লানতের বদ দুআ করা, এ ব্যাখ্যাটি স্বামী-স্ত্রীর লিআনের বিধান দ্বারা জোড়ালো হয়। অর্থাৎ কোনো পুরুষ যদি নিজের স্ত্রীকে ব্যভিচারের অপবাদ দেয় তখন একজন আরেকজনকে লিআন করে।[৪৬]

লানত দ্বারা লানতের বদদুআ এ আয়াত দ্বারাও বোঝা যায়—

فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللهِ عَلَى الْكَاذِبِيْنَ

'চলো, আমরা মিথ্যাবাদীদের ওপর আল্লাহর লানত করি।'[৪৭]

আর অপবাদদানকারীর ওপর বান্দার লানত দেওয়ার মাঝে এগুলোও অন্তর্ভুক্ত যে, অপবাদদানকারীকে বেত্রাঘাত করা হবে, তার সাক্ষ্য-প্রমাণ সর্বদা অগ্রহণযোগ্য ঘোষণা করা হবে এবং তাকে ফাসিক হিসেবে চিহ্নিত করা হবে। কেননা এটাই তার শাস্তি, এর মাধ্যমে তাকে নিরাপত্তা ও গ্রহণযোগ্যতার জায়গা থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়া হয়। অথচ সেই নিরাপত্তা ও গ্রহণযোগ্যতা ছিল (তার প্রতি) আল্লাহর রহমত। (সুতরাং লানত মানে যে আল্লাহর রহমত থেকে বিতাড়িত করা, সে অর্থটি এক্ষেত্রে প্রযোজ্য)।

তবে মানুষের অভিশাপ দেওয়া আর দুনিয়া ও আখিরাতে আল্লাহর অভিশাপ দেওয়া এক নয়। আল্লাহ যাকে দুনিয়া ও আখিরাতে অভিসম্পাত করার কথা জানিয়েছেন, এমন ব্যক্তির ওপর আল্লাহর লানতের মানে হলো তিনি তাকে তার সাহায্যের সমস্ত দিক বন্ধ করে দিয়েছেন, এবং তার রহমত প্রাপ্তির সমস্ত উপায় শেষ করে দিয়েছেন। আমাদের বক্তব্যের সমর্থনে রয়েছে আল্লাহ তাআলার এই বাণী—

وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا

---

[৪৬] লিয়ান অর্থ স্ত্রী যদি স্বামীর দাবিকে অপবাদ বলে, তখন স্বামীর দায়িত্ব প্রমাণ পেশ করা। যদি প্রমাণ আনতে না পারে তা হলে সে চারবার কসম করে বলবে, 'আমি আমার দাবিতে সত্যবাদী; পঞ্চমবার বলবে, যদি আমি আমার দাবিতে মিথ্যাবাদী হয়ে থাকে, তা হলে আমার ওপর লানত বর্ষিত হোক। তারপর স্ত্রী চারবার কসম করে বলবে, আমার স্বামী যে অপবাদ দিয়েছে, সে দাবিতে সে মিথ্যাবাদী। পঞ্চমবার সে কসম করে বলবে, 'যদি আমার স্বামী সত্যবাদী হয়, তা হলে আমার ওপর লানত বর্ষিত হোক।

[৪৭] সূরা আল ইমরান, ৩ : ৬১

‘তিনি তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন লাঞ্ছনাকর শাস্তি।’[৪৮]

কুরআনের সব জায়গায় ‘লাঞ্ছনাকর শাস্তি’ কথাটি কাফেরদের ক্ষেত্রে এসেছে। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ

‘আর কাফেরদের জন্যই রয়েছে লাঞ্ছনাকর শাস্তি।’[৪৯]

আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ

যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্যতা করবে এবং তাঁর সীমাসমূহ লঙ্ঘন করবে, তাদের জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাকর শাস্তি।[৫০]

আয়াতটি ওই সকল লোকের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে, যারা ফরয বিধানসমূহ অস্বীকার করেছে এবং লঘু করে দেখে। তবে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি তার জন্য তৈরি করা হয়েছে এখানে সেটা আলোচনা করা হয়নি বরং আযাব ও লাঞ্ছনাকর শাস্তি কেবল কাফেরদের জন্যই প্রস্তুত করা হয়েছে, কেননা জাহান্নামকে তাদের জন্যই তৈরি করা হয়েছে। সেখানে কাফেররাই প্রবেশ করবে এবং সেখান থেকে তারা আর বের হবে না। তবে মুমিনদের মধ্যে যারা কবিরা গুনাহগার, হতে পারে আল্লাহ তাদেরকে মার্জনা করার কারণে তারা জাহান্নামে প্রবেশ করবে না। অথবা হতে পারে তারা জাহান্নামে প্রবেশ করবে, কিন্তু কিছুটা বিলম্ব হলেও সেখান থেকে একসময় মুক্তি পাবে।

• ষষ্ঠ দলিল

আল্লাহ তাআলা বলেন,

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ

‘তোমরা নিজেদের আওয়াজকে নবীর আওয়াজের ওপর উঁচু করো না।’[৫১]

---

[৪৮] সূরা আহযাব, ৩৩ : ৫৭

[৪৯] সূরা বাকারাহ, ২ : ৯০

[৫০] সূরা নিসা, ৪ : ১৪

[৫১] সূরা হুজুরাত, ৪৯ : ২

এ আয়াত প্রমাণ করে যে, আল্লাহ তাআলা সাহাবায়ে কিরামকে নিষেধ করেছেন, তারা যেন নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আওয়াজের ওপর নিজেদের আওয়াজকে উঁচু না করে এবং নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সামনে যেন এমন জোরে কথা না বলে, যেমনভাবে তারা পরস্পরে কথা বলে। কেননা এর দ্বারা ব্যক্তির অজান্তেই তার আমল বরবাদ হয়ে যায়। আর যেসব কাজ সৎকর্ম বরবাদ করে দেয়, সেগুলো পরিহার করা সর্বোচ্চ পর্যায়ের অপরিহার্য। বস্তুত আমল ধ্বংস হয় কেবল কুফরির মাধ্যমে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

> 'যে ঈমানের সাথে কুফরি করবে, তার আমল বরবাদ হয়ে যাবে, আর আখিরাতে সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত।'[৫২]

কুফরি ছাড়া অন্য কিছুর মাধ্যমে আমল বরবাদ হয় না। কেননা যে ব্যক্তি মুমিন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে সে অবশ্যই জান্নাতে যাবে। যদি (ঈমান থাকা সত্ত্বেও) মুমিনের সব আমল বরবাদ হয়ে যেত তা হলে সে জান্নাতে প্রবেশ করত না কখনোই। তবে হ্যাঁ, মুমিনের কিছু কিছু আমল বরবাদ হয়ে যায়, যখন সে আমল বরবাদ করে দেওয়ার মতো কিছু ঘটে (তবে সমগ্র আমল বরবাদ হয় না)। যেমন, কেউ দান করে সেই দান নিয়ে খোটা দেয় বা কষ্টদায়ক কথা বলে। (এই খোটা বা অনুগ্রহ ফলানোর ফলে তার ওই দানটি নষ্ট হয়ে যায়)।

আয়াতের মাধ্যমে এ কথা প্রমাণিত হলো যে, নবীর সামনে জোরে বা উঁচু আওয়াজে কথা বললে ব্যক্তির অজান্তেই তার কাফের হয়ে যাওয়ার আশংকা রয়েছে। কেননা নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সামনে উঁচু আওয়াজে কথা বলাও এক প্রকার অভদ্রতা ও হেঁয়ালি আচরণ। বিষয়টি কারও বুঝে না এলেও। তা হলে যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে ও উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হয়ে রাসূলকে গালি দিবে, উপহাস করবে এবং কষ্ট দিবে, তার কী দশা হতে পারে? সে ব্যক্তি নিশ্চয় আরও আগেই কাফের।

• সপ্তম দলিল

আল্লাহ তাআলা বলেন,

لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا... فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ

---

[৫২] সূরা মায়িদাহ, ৫ : ৫

عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

যেভাবে তোমরা একে অপরকে ডাকো, ওভাবে তোমরা রাসূলকে ডেকো না। যারা তাঁর আদশ লঙ্ঘন করে, তারা যেন সতর্ক থাকে যে, কখন যেন তাদেরকে ফিতনা ঘিরে ধরে কিংবা যন্ত্রণাদায়ক আযাব তাদেরকে আক্রান্ত করে ফেলে।[৫৩]

সুতরাং যে ব্যক্তি নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আদেশ-নিষেধের বিরোধিতা করবে আল্লাহ তাকে 'ফিতনা' থেকে সতর্ক থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। আর (কুরআন মাজীদে) ফিতনা হলো কুফরি ও ধর্ম ত্যাগ করা। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ

'তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করো, যতক্ষণ-না ফিতনা অবশিষ্ট থাকে।'[৫৪]

ইমাম আহমাদ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, ফিতনা মানে হলো শিরক। এমন হতেই পারে, কেউ নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কোনো কথা প্রত্যাখ্যান করল, ফলে তার অন্তরে বক্রতা তৈরি হল; আর এই বক্রতাই তাকে ধ্বংস করে ফেলল।' এরপর তিনি এই আয়াত তিলাওয়াত করেন,

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

না, হে মুহাম্মদ! তোমার রবের কসম! এরা কখনও মুনিন হতে পারে না যতক্ষণ এদের পারস্পারিক মতবিরোধের ক্ষেত্রে এরা তোমাকে ফয়সালাকারী হিসেবে মেনে না নেবে, তারপর তুমি যা ফয়সালা করবে তার ব্যাপারে নিজেদের মনের মধ্য কোনো প্রকার কুণ্ঠা ও দ্বিধার স্থান দেবে না, বরং সর্বান্তকরণে মেনে নেবে৷ [৫৫]

এরপর ইমাম আহমাদ রাহিমাহুল্লাহ আরও বলেন, 'আমি তাদেরকে দেখে অবাক হই, যারা হাদীসের সনদ ও এর বিশুদ্ধতা সম্পর্কে জেনেও অমুক-তমুকের রায় গ্রহণ করে।' এ কথা বলে ইমাম আহমাদ রাহিমাহুল্লাহ এই আয়াতটি তিলাওয়াত করেন,

---

[৫৩] সূরা নূর, ২৪ : ৬৩

[৫৪] সূরা বাকারাহ, ২ : ১৯৩

[৫৫] সূরা নিসা, ৪ : ৬৫

فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

> যারা তাঁর আদশ লঙ্ঘন করে, তারা যেন সতর্ক থাকে যে, কখন যেন তাদেরকে ফিতনা ঘিরে ধরে কিংবা যন্ত্রণাদায়ক আযাব তাদেরকে আক্রান্ত করে ফেলে।[৫৬]

এরপর তিনি বললেন, 'জানো, ফিতনা কী? ফিতনা হলো কুফর। (আয়াতের ব্যাখ্যা হলো) ওরা হাদীসকে ছেড়ে দেয় আর প্রবৃত্তি তাদেরকে তাড়িত করে যুক্তি ও মতের দিকে নিয়ে যায়।'

নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আদেশ লঙ্ঘনকারীকে যদি কুফরির ও যন্ত্রণাদায়ক আযাবের বিষয়ে সতর্ক করা হয়, তা হলে ওই ব্যক্তির হুকুম কী হতে পারে, যে নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কটূক্তিমূলক ও মানহানিকর আরও জঘন্য কথা বলে?

উল্লেখ্য, রাসূলের আদেশ অমান্য করা কুফরির দিকে নিয়ে যায়, কেননা আদেশ অমান্য করার মাঝে আদেশদাতার প্রতি তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য ভাব নিহিত রয়েছে, যেমনটা ইবলিস করেছিল।

আসলে আলোচ্য-বিষয় ব্যাপক বিস্তৃত। তবে আলহামদুলিল্লাহ এ বিষয়ে উম্মাহ একমত।

• অষ্টম দলিল

আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا

> তোমাদের জন্য কখনোই বৈধ নয় আল্লাহর রাসূলকে কষ্ট দেওয়া এবং তাঁর (মৃত্যুর) পরে তার স্ত্রীদেরকে বিয়ে করা।[৫৭]

আল্লাহ তাআলা নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ওফাতের পরে তার স্ত্রীদেরকে বিবাহ করা উম্মতের জন্য হারাম করে দিয়েছেন। কেননা এটা নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ব্যথিত করবে। আল্লাহ তাআলা এ অপরাধকে গুরুতর বলে ঘোষণা দিয়েছেন। তারপরও যদি কোনো ব্যক্তি নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-

---

[৫৬] সূরা নূর, ২৪ : ৬৩

[৫৭] সূরা আহযাব, ৩৩ : ৫৩

এর ওফাতের পরে তাঁর স্ত্রীগণকে কিংবা তাঁর দাসীগণকে বিয়ে করে, তা হলে তার শাস্তি হলো হত্যা।

নবীর স্ত্রীগণকে বা দাসীগণকে বিয়ে করার দ্বারা নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সম্মানহানি করার কারণে তার শাস্তি যদি হয় কতল, তবে রাসূলের কটূক্তিকারীর শাস্তি তো আরও আগেই কতল।

এর প্রমাণ

সহীহ মুসলিমে উল্লেখিত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হাদীসটি। অনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর এক বাদীর ব্যাপারে একলোককে অপবাদ দেওয়া হচ্ছিল। সেই বাদীর গর্ভে রাসূলের সন্তানও হয়েছিল। নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে ওই ব্যক্তির গর্দান উড়িয়ে দেওয়ার আদেশ দেন। আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন তার কাছে আসলেন, তখন লোকটা একটা কূপের মাঝে শীতলতা উপভোগ করছিল। আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে বললেন, বের হ! তিনি লোকটাকে হাত ধরে টেনে ওঠালেন। উঠিয়ে দেখেন লোকটা লিঙ্গকর্তিত। ফলে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে আর কিছু বললেন না। তিনি নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে এসে বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! সে তো লিঙ্গহীন।' অর্থাৎ তার পক্ষে তো আপনার দাসীর সাথে যিনায় লিপ্ত হওয়া সম্ভবই নয়। এটা স্রেফ অপবাদ।

নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আশয়াসের বোন কাইলাহ বিনতু কাইসকে বিয়ে করেছিলেন। কিন্তু তার সাথে মিলন বা তার কাছে গমনের পূর্বেই নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ইন্তেকাল হয়। আবার এমনও বলা হয়, নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে ইচ্ছাধিকার দিয়েছিলেন, হয় (উম্মুল মুমিনীন হিসাবে) তাঁর ওপর বিশেষ হিজাবের বিধান আরোপিত হবে এবং তিনি উম্মুল মুমিনীনদের অন্তর্ভুক্ত হবেন, না হয় রাসূল তাঁকে তালাক দিয়ে দিবেন ফলে তিনি যাকে ইচ্ছা বিয়ে করতে পারবেন। তিনি অন্য কাউকে বিয়ে করার অধিকার বেছে নিলেন।

নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ওফাতের পরে ইকরিমা রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁকে বিয়ে করেন। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু এ খবর শুনে দুজনকেই হত্যা করতে উদ্ধত হন। তখন উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁকে বলেন, তিনি তো উম্মাহাতুল মুমিনীনদের অন্তর্ভুক্ত নন।' ফলে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে ছেড়ে দেন।[৫৮]

---

[৫৮] হাকিম, আল-মুসতাদরাক : ৬৮১৭

সুন্নাহ থেকে দলিল

• **প্রথম হাদীস**

ইমাম শাবি রাহিমাহুল্লাহ আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন যে,

أَنَّ يَهُودِيَّةً كَانَتْ تَشْتِمُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَتَقَعُ فِيهِ فَخَنَقَهَا رَجُلٌ حَتَّى مَاتَتْ فَأَبْطَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم دَمَهَا

> 'এক ইহুদি মহিলা নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে গালমন্দ করত। ফলে একলোক তাকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করলেন। তখন নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (মুক্তিপণের পরিবর্তে) ওই মহিলার রক্ত মূল্যহীন ঘোষণা করেন।'[৫৯]

হাদীসটি বর্ণনা করেছেন ইমাম আবু দাউদ ও ইবনে বাত্তাহ রাহিমাহুমুল্লাহ। ইমাম আহমাদ রাহিমাহুল্লাহ হাদীসটি দলিল হিসেবে পেশ করেছেন।[৬০]

আরেক বর্ণনায় এসেছে, সেই হত্যাকারী লোকটি অন্ধ ছিলেন। হাদীসটির সনদ জাইয়িদ ও মুত্তাসিল। কেননা ইমাম শাবি রাহিমাহুল্লাহ আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন। আর যদি মুরসালও হয়, তবুও হাদীসটি সর্বসম্মতিক্রমে প্রমাণযোগ্য। কেননা ইমাম শাবি রাহিমাহুল্লাহ বর্ণিত মুরসাল বর্ণনাগুলোও মুহাদ্দিসগণের নিকটে সহীহ। কারণ তার যত মুরসাল বর্ণনা আছে, সবই সহীহ হিসেবে প্রমাণিত।

নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে গালমন্দ করার কারণে অভিশপ্ত ইহুদি নারীকে হত্যা করার ব্যাপারে হাদীসটি একেবারেই দ্ব্যর্থহীন। আর এই হাদীসটি আরও স্পষ্টভাবে ওই সকল যিম্মি ও মুসলিম নারী-পুরুষের রক্ত হালাল বানানোর দলিল,

---

[৫৯] আবু দাউদ, আস-সুনান : ৪৩৬৪

[৬০] খাল্লাল, আল-জামি : ২/৩৪১

যারা নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে গালমন্দ করে।

• দ্বিতীয় হাদীস

ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুম থেকে বর্ণিত, 'এক অন্ধ লোকের একটি 'উম্মু ওয়ালাদ'[৬১] দাসী ছিল। সে নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে গালমন্দ করত, তাকে নিয়ে কটূক্তি করত। ফলে অন্ধ লোকটি ধারালো একটি ছুরি নিয়ে দাসীর পেটে বিঁধিয়ে দিয়ে চেপে ধরে রাখলেন। এই ঘটনা নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে শুনানো হলে তিনি ওই দাসীর রক্ত মূল্যহীন ঘোষণা করেন।'[৬২]

আবু দাউদ ও নাসাঈ রাহিমাহুমাল্লাহ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। ইমাম আহমাদ হাদীসটিকে দলিল হিসেবে পেশ করেছেন। হতে পারে এই ঘটনাটা হুবহু প্রথম ঘটনা। সেক্ষেত্রে এই ঘটনার বাদিও ইহুদি হবে। কাযি আবু ইয়া'লা রাহিমাহুমুল্লাহ-সহ অন্যান্য আলেমদের অভিমত এটাই। তারা উভয় হাদীসের ঘটনাকে একই ঘটনা মনে করেন। অথবা হতে পারে এটা ভিন্ন আরেকটা ঘটনা।

ইমাম খাত্তাবি রাহিমাহুল্লাহ বলেন,

> وفيه بيان ان ساب النبي مقتول وذلك أن السب منها لرسول الله ارتداد عن الدين
>
> 'এ হাদীস থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, আল্লাহর নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর গালমন্দকারীকে হত্যা করা হবে। কারণ, গালমন্দ বা অমার্জিত ভাষা ব্যবহার করা মানে মুরতাদ হয়ে যাওয়া বা ইসলাম ত্যাগ করা।'[৬৩]

ইমাম খাত্তাবি রাহিমাহুল্লাহ-এর কথা এ দিকে ইঙ্গিত করে যে, তিনি কিটূক্তিকারী নারীটিকে মুসলিম ছিল বলে মনে করেন। কেননা ইমাম খাত্তাবির কথায় ব্যবহৃত 'ইরতিদাদ' মানে ইসলাম ত্যাগ করা। কটূক্তিকারী নারীটির মুসলিম হওয়ার কোনো দলিল হাদীসের মধ্যে নেই, বরং হাদীস থেকে বাহ্যত বোঝা যায়, মহিলাটি কাফের ছিল। কেননা হাদীসে উল্লেখ আছে যে, কটূক্তিকারী দাসীর মনিব তাকে এহেন কাজ থেকে কয়েকবার নিষেধ করেছিলেন। সুতরাং দাসীটি যদি মুরতাদ হতো তা হলে তার সাথে সহবাস করা ও দীর্ঘ সময় ধরে নিজের অধীনে রাখা কোনোভাবেই মুসলিম

---

[৬১] 'উম্মু ওয়ালাদ' অর্থ যে দাসীর সাথে মনিবের শারীরিক সম্পর্ক হওয় এবং তার গর্ভে মনিবের সন্তানও জন্ম লাভ করে।

[৬২] আবু দাউদ, আস-সুনান : ৪৩৬৩

[৬৩] খাত্তাবি, মায়ালিমুস সুনান : ৩/২৯৬

মনিবের জন্য বৈধ হতো না।

• তৃতীয় হাদীস

এটি সেই হাদীস, যে হাদীস দিয়ে ইমাম শাফেঈ রাহিমাহুল্লাহ দলিল দেন যে, কোনো যিম্মিও যদি রাসূলকে কটূক্তি করে, তা হলে তাকে হত্যা করা হবে। হাদীসটি ইহুদি কবি ও গোত্রনেতা কাব ইবনে আশরাফের ঘটনা-সম্বলিত বর্ণনা। ঘটনাটি প্রসিদ্ধ ও স্বতঃসিদ্ধ। একবার নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন,

مَنْ لِكَعْبِ بْنِ الأَشْرَفِ فَإِنَّهُ قَدْ آذَى اللهَ وَرَسُولَهُ

> 'কে আছো কাব ইবনে আশরাফের জন্য? সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে কষ্ট দিয়েছে।'

তখন মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা রাদিয়াল্লাহু আনহু দাঁড়িয়ে বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কি চান আমি তাকে হত্যার দায়িত্ব নিই?' তিনি বললেন, 'হ্যাঁ।' তখন সাহাবি বললেন, 'তা হলে আমাকে কিছু কৌশলী কথা বলার অনুমতি দিন।' নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অনুমতি দিলেন। মুহাম্মাদ বিন মাসলামা কাবের কাছে এসে বললেন, এই লোকটা (মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তো এখন আমাদের কাছে সাদাকা চাচ্ছে। লোকটা আমাদেরকে অতিষ্ঠ করে তুলেছে।' কাব এ কথা শুনে বলল, তোমরা তার ব্যাপারে আরও অতিষ্ঠ হয়ে উঠবে।' (এভাবে তিনি কাবের সাথে ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠেন।) পরিশেষে তিনি তাকে হত্যা করেন।[৬৪]

হাদীসটি বুখারী ও মুসলিমে আছে। কাব ইবনে আশরাফ নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিন্দা করত। ফলে নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে হত্যা করার আহ্বান জানান। কাবের জনবল নবীজির কাছে এসে বলল, 'আমাদের সরদার কাবকে গুপ্তহত্যা করা হয়েছে।' নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'অন্যদের মতো সেও যদি সংযত থাকত তা হলে সে ক্ষতির মুখোমুখি হত না। আমরা তার থেকে কষ্ট পেয়েছি, সে আমাদের নামে নিন্দা-কাব্য রচনা করেছে। তোমাদের কেউ যদি এমন জঘন্য কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হয়, তা হলে তরবারিই তার ফয়সালা করবে।'

এ পর্যায়ে ইহুদিরা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। কাব ইবনুল আশরাফের হত্যার পর থেক তারা পুরোপুরি সাবধান হয়ে যায়।

---

[৬৪] বুখারী, আস-সহীহ : ৩৮১১; মুসলিম, আস-সহীহ : ৪৭৬৫।

কাব ইবনুল আশরাফ তো নিরাপত্তা-চুক্তিতে আবদ্ধ যিম্মি ছিল। যখন সে কটূক্তি করল, তখন তার নিরাপত্তা-চুক্তি ভেঙে গেল। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার ব্যাপারে বলেন,

فَإِنَّهُ قَدْ آذَى اللهَ وَرَسُولَهُ

'কেননা সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে কষ্ট দিয়েছে।'

সুতরাং যে-কেউই আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে কষ্ট দিবে তাকে হত্যা করা হবে। আর মুসলমানদের সর্বসম্মতিক্রমে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে কটূক্তি করার দ্বারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে কষ্ট দেওয়া হয়। সুতরাং কটূক্তির কারণে হত্যার বিধান অবধারিত।

• চতুর্থ হাদীস

আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

مَنْ سَبَّ نَبِيًّا قُتِلَ، وَمَنْ سَبَّ أَصْحَابِي جُلِدَ

'যে ব্যক্তি কোনো নবীকে গালি দিবে তাকে হত্যা করা হবে, আর যে ব্যক্তি আমার কোনো সাহাবিকে গালি দিবে তাকে বেত্রাঘাত করা হবে।'[৬৫]

হাদীসটি বর্ণনা করেছেন আবু মুহাম্মাদ আল-খাল্লাল, আল-আযাজিয়্যি ও আল-হারাওয়ি। হাদীসের থেকে বোঝা যায় যে, এমন ব্যক্তিকে হত্যা করতে হবে, তাওবার সুযোগ দেওয়া হবে না।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যা রাহিমাহুল্লাহ বলেন, এ হাদীসের একজন বর্ণনাকারী হলো আব্দুল আযিয ইবনে হাসান ইবনে যাবালাহ, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল।

• পঞ্চম হাদীস

আব্দুল্লাহ ইবনে কুদামা রাহিমাহুল্লাহ আবু বারযাহ আসলামি থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, এক লোক আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর প্রতি কঠিন-ভাষা ব্যবহার করেন। আমি আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বললাম, আমি কি তাকে হত্যা করব?

---

[৬৫] তাবারানি, মুজামুস সাগির : ৬৫৯

তখন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু আমাকে ধমক দিয়ে বললেন, 'এমন হুকুম তো নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে গালমন্দকারী ছাড়া অন্য কারও জন্য নয়।'[৬৬]

আরেক বর্ণনায় আছে, এক লোক আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে গালি দিয়েছিল। তখন তিনি উক্ত কথাটি বলেন। আবু দাউদ রাহিমাহুল্লাহ হাদীসটি তার সুনানে সহীহ সনদে বর্ণনা করেছেন।[৬৭]

অনেক আলেম এ হাদীস দ্বারা দলিল পেশ করেছেন যে, নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে গালমন্দকারীর শাস্তি হত্যা। এই অভিমত-পোষণকারীদের মধ্যে আছেন ইমাম আবু দাউদ, ইসমাইল ইবনে ইসহাক, আবু বকর আব্দুল আযিয এবং কাযি আবু ইয়া'লা প্রমুখ। এই হাদীসটি থেকে বোঝা গেল, যে ব্যক্তি নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কটূক্তি করবে তাকে হত্যা করা বৈধ। হাদীসটি কাফের-মুসলিম উভয় ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

• ষষ্ঠ হাদীস

আসমা বিনতু মারওয়ানের ঘটনা। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, খাতমা গোত্রের এক নারী কবিতায় রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অপমান করে। তখন নবীজি বললেন—'এই মহিলার ব্যাপারে আমার পক্ষে কে আছ?' অখন তার গোত্রের এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি।'

এরপর লোকটা উঠে গিয়ে সেই মহিলাকে হত্যা করল। হত্যা করে ফিরে এসে সংবাদটা রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জানালে তিনি বললেন, 'মাদি ছাগল দুটো তাকে নিয়ে আর গুঁতোগুঁতি করবে না।'[৬৮]

বিভিন্ন মাগাযি-বিশেষজ্ঞদের কাছে ঘটনাটা প্রচলিত। এই মহিলাকে হত্যা করা হয় রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বদর থেকে ফিরে আসার পর, পঁচিশে রমাদান। ঘটনাটি উল্লেখ করেছেন ইতিহাস-বিশেষজ্ঞগণ। যেমন ইবনে সাদ, আল-আসকারি, আবু উবাইদ তার *আল-আমওয়াল* গ্রন্থে এবং ওয়াকিদি-সহ এবং অন্যান্যরা। এটি একটি প্রসিদ্ধ ঘটনা। আর এই অভিশপ্ত মহিলাকে হত্যা করার কারণ ছিল সে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে গালমন্দ করত।

---

[৬৬] নাসাঈ, সুনানুল কুবরা : ৩৫৩৪

[৬৭] আবু দাউদ, আস-সুনান : ৪৩৬৫

[৬৮] ওয়াকিদি, আল-মাগাযি : ১/১৭২-১৭৩ সনদ মুনকাতি; ইবনে আদি, আল-কামিল : ৬/১৪৫।

• সপ্তম হাদীস

ইহুদি আবু আফাকের ঘটনা। মাগাযি-বিশেষজ্ঞ ও ইতিহাসবিদগণ এটি উল্লেখ করেছেন। তার কাজই ছিল রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর শানে কটূক্তিমূলক কবিতা আবৃত্তি করা।

রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন বদরের যুদ্ধে বেরিয়ে পড়লেন এবং আল্লাহর সাহায্যে বিজয় লাভ করে ফিরলেন, তখন সে নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আরও হিংসা করতে লাগল। সে নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিন্দা করে কবিতা আবৃত্তি করল এবং নবীজির অনুসারীদেরকেও কটূক্তি করল। তার কবিতার জঘন্যতম একটি অংশ ছিল—

‘এক আরোহী তাদের তাদের বৈধ-অবৈধ সবকিছুই ছিনিয়ে নেয়।’

সালিম ইবনে উমাইর বলেন, ‘আমি নযর করেছি, তাকে আমি হত্যা করব।’ ইবনে সাদ উল্লেখ করেছেন যে, ‘সে ইহুদি ছিল।’[৬৯] তবে এ বর্ণনাটি ইতিহাসবিদদের। তারপরও নিশ্চিতভাবে এটি এ-সংক্রান্ত অন্যান্য হাদীসকে সমর্থন ও জোড়ালো করতে পারে।

• অষ্টম হাদীস

আনাস ইবনে যুনাইম আদদিলির ঘটানাটি। সীরাত-বিশারদদের কাছে হাদীসটি প্রসিদ্ধ। ইবনে ইসহাক, ওয়াকিদি-সহ অন্যান্য আলেমগণ এটি বর্ণনা করেছেন। এই লোকটা রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কটূক্তি করে কবিতা রচনা করেছিল। খুযায়াহ গোত্রের এক মুসলিম তরুণ বিষয়টা শুনতে পেয়ে তার মাথা ফাটিয়ে দেয়। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার রক্তকে মূল্যহীন ঘোষণা করেন। অর্থাৎ এই অপরাধের কারণে আঘাতকারীকে কোনো শাস্তিই দেননি।

আনাস ইবনে যুনাইম যখন নবীজির পক্ষ থেকে তার রক্তমূল্যহীনতার ফরমান সম্পর্কে অবহিত হয় তখন সে নবীজির কাছে নিজের অপরাগতার কথা প্রকাশ করে এবং নবীজির ভূয়সী প্রশংসা করে একটি কবিতা আবৃত্তি করে। কবিতার প্রথমাংশ নিম্নরূপ—

আপনি কি সেই মহান ব্যক্তি নন,

---

[৬৯] ইবনে সাদ, আত-তাবাকাত : ২/২৮

যার আদেশে 'মায়াদ' গোত্রকে হিদায়াত দেওয়া হয়?
বরং হিদায়াত আল্লাহ দেন, আর আপনাকে বলেন, তুমি সাক্ষী থেকো।
কোনো উটনী বহন করেনি নিজের পরে
মুহাম্মাদের চেয়ে সৎ, মহৎ ও আমানতদারকে।

হে রাসূল! আপনি আমাকে পাকড়াও করতে সক্ষম।
আপনার পক্ষ থেকে একটি হুঁশিয়ারিই তো পাকড়াও সমতুল্য।
হে রাসূল! তিহামাহ ও নজদের সমস্ত অধিবাসীর ওপর
আপনি তো কর্তৃত্ব প্রয়োগের অধিকার রাখেন ।
রাসূলকে বলা হয়েছে, আমি নাকি তার মানহানি করেছি।
(রটনাকারীরা জেনে নিক) আমার চাবুক নিজের ওপরে চাবুক মারেনি।
আমি না কারও মানহানি করেছি, আর না কারও খুন ঝরিয়েছি।
একটু ভেবে দেখুন, হে সত্যের প্রসারী! এরপর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করুন।

যখন তার এই কবিতা রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে পৌঁছে এবং তিনি তার পক্ষ থেকে অপরাগতা স্বীকারের কথা জানতে পারেন, তখন তিনি নওফাল ইবনে মুয়াবিয়ার সাথে তার ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করেন। তখন নাওফালও তার জন্য সুপারিশ করেন, অন্যদিকে বনু খুযায়ার এক বালক তো তার মাথা আগেই ফাটিয়ে দেয়। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'ঠিক আছে, আমি তাকে মাফ করে দিলাম।'

তখন নাওফাল বলেন, 'আমার মা-বাবা আপনার জন্য উৎসর্গ হোক।' এরপর আনাস ইবনে যুনাইম রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে এসে আবার ওযর পেশ করে বলেন, তারা আমার নামে মিথ্যা বলেছে।

এখানে দলিল হলো, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরাইশদের সাথে দশ বছরের জন্য সন্ধিচুক্তি করেন। এই চুক্তির আওতায় বনু খুযায়াহ ও বনু বকরও

অন্তর্ভুক্ত ছিল[৭০]। এ চুক্তির অধীনে আনাস ইবনে যুনাইমও ছিল। কিন্তু অভিযোগ অনুযায়ী সে নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিন্দা করে কবিতা আবৃত্তি করেছিল, যার ফলে চুক্তিবদ্ধ থাকা সত্বেও অন্য আরেকজন তার মাথা ফাটিয়ে দেয়।

তারা যদি না জানতেন যে, চুক্তিবদ্ধ ব্যক্তিও যদি রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ব্যাপারে কটূক্তি করে তা হলে তাকেও শায়েস্তা করা অপরিহার্য, তা হলে তারা তো তার মাথা ফাটিয়ে দিতেন না।

তাই তো প্রথমে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার রক্তকে মূল্যহীন ঘোষণা করেছিলেন। আর এই হুকুমই বোঝায় যে, কটূক্তিকারী চুক্তিবদ্ধ হলেও তার রক্ত বৈধ। এরপর সে যখন নিজের কবিতার মধ্য দিয়ে ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দেয়, তখন থেকে সবাই তাকে সাহাবাদের অন্তর্ভুক্ত মনে করেন।

তার কবিতার এই অংশের প্রতি লক্ষ্য করুন, 'জেনে নিন হে আল্লাহর রাসূল!' এই বাক্যটি তার ইসলাম প্রমাণ করে। সাথে সাথে সে নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সমালোচনার বিষয়টিও অস্বীকার করে । এমনকি তার বিরুদ্ধে যারা সাক্ষ্য প্রদান করেছিল সে তাদের সাক্ষ্যকে এই বলে প্রত্যাখ্যান করেছে যে, এরা তো আমার শত্রুগোত্র, আমাদের মধ্যে অনেক যুদ্ধ-বিগ্রহ হয়েছে।

আমাদের বক্তব্য হলো, রাসূলকে কটূক্তি করার কারণে যদি রক্ত বৈধ বা মূল্যহীন না হত তা হলে তো এসব কোনো কিছুরই প্রয়োজন হতো না।

তারপরও, সে ইসলাম এনে, ওযর পেশ করে, বিরোধীদের বক্তব্য খণ্ডন ও মিথ্যা-প্রতিপন্ন করে এবং নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রশংসা করেও, রাসূলের কাছে ক্ষমা চাচ্ছে, যেন তিনি তার হত্যা ও রক্ত-বৈধতার ফরমান উঠিয়ে নেন। অপরাধীকে যখন শাস্তি দেওয়া বৈধ, ক্ষমা তো তখনই যথার্থ হয়ে থাকে।

তাই বোঝা যায়, সে মুসলিম হয়ে, ওযর পেশ করেও শাস্তি পাওয়ার যোগ্য ছিল এবং নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চাইলে তাকে শাস্তি দিতে পারতেন। কিন্তু তিনি নিজের মহানুভবতা ও দায়ার কারণে তাকে ক্ষমা করে দেন। তা ছাড়া তার সাথে যে চুক্তি সম্পন্ন হয়েছিল সেটা ছিল যুদ্ধবিরতিমূলক চুক্তি, জিযিয়াভিত্তিক কোনো চুক্তি ছিল না। যুদ্ধবিরতির চুক্তিতে আবদ্ধ ব্যক্তি নিজের দেশে যা ইচ্ছা প্রকাশ করতে পারে। যতক্ষণ-না সে আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের উস্কানি বা ঘোষণা দেয়, ততক্ষণ পর্যন্ত সে

[৭০] খুযাআ ছিল নবিজির মিত্র। আর বনু বকর ছিল কুরাইশদের মিত্র।

চুক্তি ভঙ্গ হয় না।

তা হলে জানা গেল, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিয়ে কটূক্তি করা একপ্রকার যুদ্ধে-নামার মতো, বরং আরও গুরুতর। আর যে কটূক্তিকারী, তার জন্য কোনো ধরনের নিরাপত্তা-বিধান থাকবে না।

• নবম হাদীস

ঘটনাটা ইবনে আবি সারহের। এই ঘটনার ব্যাপারে আহলুল ইলমগণ একমত। বিষয়টা তাদের কাছে এতটাই প্রসিদ্ধ যে, এটি এক ব্যক্তির বর্ণনা হওয়ার সুযোগই নেই। ঘটনাটা হলো—

মক্কা বিজয়ের দিন আব্দুল্লাহ ইবনে সাদ ইবনে আবি সারহ উসমান ইবনে আফফান রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর নিকট লুকিয়ে থাকেন। কোনোমতে তাকে নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে উপস্থিত করেন তিনি এবং বলেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আব্দুল্লাহকে (ইসলামের ওপর) বাইয়াত করান।' নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাথা উঠিয়ে তার দিকে তাকান। উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু তিনবার একই কথা পুনরাবৃত্তি করেন। আর প্রত্যেকবারই নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বাইয়াত করতে অস্বীকৃতি জানান। তিনবারের পর তাকে বাইয়াত করে নেন। তারপর নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবাদের বললেন,

> أَمَا كَانَ فِيكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ يَقُومُ إِلَى هَذَا حَيْثُ رَآنِي كَفَفْتُ يَدِي عَنْ بَيْعَتِهِ فَيَقْتُلُهُ
>
> 'কী ব্যাপার! তোমাদের মধ্যে কি এমন কোনো চৌকস লোক নেই, যে আমাকে যখন দেখল আমি তার দিকে হাত বাড়াইনি, তখনই তার গর্দান উড়িয়ে দিত?'

সাহাবায়ে কেরাম জবাব দিলেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা তো জানি না আপনার মনের চাওয়া কী ছিল। আপনি আমাদেরকে কেন চোখ দিয়ে ইঙ্গিত করলেন না?' তখন নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'তোমরা কী জানো না যে, কোনো নবীর জন্য চোখের খেয়ানত সমীচীন নয়?'[৭১]

---

[৭১] আবু দাউদ, আস-সুনান : ২৬৮৫; নাসাঈ, আস-সুনান : ৪০৬৭; সনদ সহীহ।

রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তো তার রক্ত মূল্যহীন করে দিয়েছিলেন। কিন্তু সে উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর দুধভাই ছিল। তাই উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকটে তার জন্য সুপারিশ করেছিলেন, ফলে তিনি তাকে মাফ করে দেন।

কিন্তু সে ইসলাম গ্রহণের পর ফের মুরতাদ হয়ে মুশরিকদের দল ভারি করে। অথচ সে ইসলাম গ্রহণের পর নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ওহি-লেখকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এরপর সে মুশরিকদের দলে ভিড়ে প্রচার করতে থাকে, 'আমি যেভাবে চাইতাম সেভাবেই কুরআনকে পরিবর্তন করতাম, কেননা তিনি আমাকে কিছু (ওহি) লিখার আদেশ দিতেন। আমি তাকে বলতাম, 'এমন অথবা এমন লিখলে হবে?' তিনি বলতেন, 'হাঁ, হবে।' নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বলতেন 'আলেমুন হাকিম' লেখো। সে বলত, 'আযিযুন হাকিম' লিখলে হবে কি? তিনি বলতেন, হ্যাঁ! দুটো তো একই।[৭২]

বলা হয় যে, এই আয়াতটি তার ব্যাপারে নাযিল হয়েছিল—[৭৩]

> وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللهُ...
>
> ওই ব্যক্তির চেয়ে বড় জালিম কে হতে পারে, যে আল্লাহর নামে মিথ্যা বলে কিংবা বলে—আমার প্রতি ওহি অবতীর্ণ হয়েছে, অথচ তার প্রতি কিছুই অবতীর্ণ হয়নি অথবা বলে আল্লাহ যেমন নাযিল করেছেন, ওমন আমিও অচিরেই ওহি নাযিল করব।[৭৪]

এই হাদীস থেকে জানা যায়, সে নবীর ওপর মিথ্যা আরোপ করে এবং মানুষের মাঝে বানোয়াট কথা ছড়াতে থাকে যে, তিনি তাকে ওহি লেখতে বলতেন, তার যা ইচ্ছা হত, তাই লিখত আর নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেটাকেই বহাল রাখতেন। নিশ্চয় এ মিথ্যাচারও নবীর নামে একপ্রকারের কটূক্তি। ওহি বিকৃতকরণের দাবি সে ছাড়াও আরেকজন করেছিল। আল্লাহ তাআলা তাকে পাকড়াও করেন। তার মৃত্যুর পর লোকেরা তাকে যেখানেই দাফন করে মাটি তাকে উগড়ে দেয়।[৭৫] আর এটাই হচ্ছে

---

[৭২] ইবনে হিশাম, আস-সিরাত : ২/৪০৯

[৭৩] তাবারি, জামিউল বায়ান : ৫/২৬৮; ওয়াহিদি, আসবাবুন নুযুল : ২৪৫ পৃ.।

[৭৪] সূরা আনয়াম, ৬ : ৯৩

[৭৫] বিস্তারিত—বুখারী, আস-সহীহ, কিতাবুল মানাকিব : ৩৬১৭।

সুস্পষ্ট দলিল যে, যে বা যারাই নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ব্যাপারে অশালীন মন্তব্য করবে আল্লাহ তাআলা তার থেকে প্রতিশোধ নিবেন, তাকে শায়েস্তা করবেন। সুতরাং তাওবা করে ইসলাম গ্রহণের পরও আব্দুল্লাহ ইবনে আবি সারহের রক্ত বৈধ হওয়া, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবায়ে কিরামকে 'কেন তোমরা তাকে হত্যা করোনি?'—এ কথা বলা, এরপর তাকে ক্ষমা করে দেওয়া এসব প্রক্রিয়া থেকে বোঝা যায়, নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চাইলে তাকে হত্যা করতে পারেন, চাইলে ক্ষমাও করতে পারেন।

আবার এটাও প্রমাণ হয় যে, যে ব্যক্তি নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে গালমন্দ করবে তিনি তাকে হত্যা করার পূর্ণ অধিকার রাখেন, যদিও সে তাওবা করে ইসলামের দিকে ফিরে আসে।

বিশুদ্ধ বর্ণনায়[৭৬] আছে, ইবনে আবি সারহ মক্কা-বিজয়ের আগেই ইসলামে ফিরে আসে। সে উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলে, 'আমি সত্যিই অনেক বড় অপরাধ করেছি। এখন আমি তাওবা করে আবার ফিরে এসেছি।' তারপর লোকজন যখন একটু স্থিমিত ও প্রশান্ত হয় তখন উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে নিয়ে নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দরবারে হাজির হন। নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মনে মনে চাইছিলেন যেন মুসলমানরা তাকে হত্যা করে ফেলে। এ জন্য তিনি বেশ কিছুক্ষণ সময় অপেক্ষা করেন, এরই মধ্যে কেউ তাকে স্বেচ্ছায় হত্যা করে কি না এ জন্যে। নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভাবছিলেন, হয়তো কেউ তাকে শীঘ্র হত্যা করে ফেলবে। ...এই যে এতকিছু ঘটল, এগুলো স্পষ্ট প্রমাণ করে যে, ইসলাম গ্রহণের পরও তাকে হত্যা করা বৈধ ছিল।

আব্দুল্লাহ ইবনে আবি সারহ এবং আরেকজন খ্রিষ্টান ওহি-লেখক নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ওপর যে মিথ্যা অভিযোগ করে বলে, তাদের ওহি-বিকৃতির কর্মকাণ্ড সম্পর্কে তিনি জানতেন (কিন্তু কিছুই বলতেন না, বরং সমর্থন করতেন)—এটা ডাহা মিথ্যা কথা। কেননা নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওইটাই লেখাতেন যেটা আল্লাহ তাআলা নাযিল করতেন, ওইটাকেই ঠিক রাখতে বলতেন যেটাকে আল্লাহ তাআলা ঠিক রাখতে বলেছেন। নিজের ইচ্ছামাফিক কোনো রদবদল করতেন না। বরং আল্লাহ তাআলা যেভাবে চাইতেন সেভাবেই তিনি লিপিবদ্ধ করাতেন। তবে আহলুল ইলমগণ এতটুকু মতবিরোধ করেন যে, নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

---

[৭৬] শাইখুল ইসলাম এ ঘটনার বিশুদ্ধতা দাবি করেননি। তিনি এভাবে বর্ণনা করেছেন যে, 'ইকরিমাহ থেকে বর্ণিত হয়েছে।' মূলত এটি ইমাম বা'লির দাবি। (অনুবাদক)

তাকে যেটা লেখার নির্দেশ দিতেন তার বিপরীত লিখলেও কি নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সমর্থন করতেন এবং তাকে এ ব্যাপারে কিছুই বলতেন না? এ ব্যাপারে আলেমগণ দুটো মত পেশ করেছেন—

✓ প্রথম মত

এই খ্রিষ্টান ও ইবনে আবি সারহ আগাগোড়োই মিথ্যাচার করেছে। নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা লিখতে দিয়েছিলেন তার বিপরীত কোনো কিছু স্বীকৃতি দেওয়ার মতো কোনো ঘটনাই ঘটেনি। বরং তারা উভয়ে মনগড়াভাবে বানিয়ে-বুনিয়ে মানুষের সামনে ছড়িয়ে দেয় লোকদেরকে ইসলামের ব্যাপারে সন্দিহান করে তোলার জন্য।

✓ দ্বিতীয় মত

হ্যাঁ, নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে লিখতে বলতেন। অর্থাৎ তিনি তার সামনে পাঠ করে, তাকে লিখতে বলতেন, سميعا بصيرا কিন্তু সে লিখত سميعا عليما। ফলে তাকে বলতেন ঠিক আছে, যেভাবে আছে সেভাবেই রেখে দাও—এ-জাতীয় কিছু কথাবার্তা হত।[৭৭]

হতে পারে দুভাবেই নাযিল হয়েছিল, ফলে নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বলতেন, 'এভাবে লিখো, চাইলে ওভাবেও লিখতে পারো। কেননা উভয়টাই সঠিক।' কেননা আল্লাহর নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে স্পষ্টভাবে হাদীস বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন—

أُنْزِلَ الْقُرْآنُ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ

'কুরআন সাত রীতি বা পাঠ-পদ্ধতিতে অবতীর্ণ হয়েছে।'[৭৮]

সকল পদ্ধতিই তৃপ্তিদায়ক ও গ্রহণযোগ্য। আপনি যদি عزيز حكيم এর পরিবর্তে غفور رحيم বলেন, তা হলেও ব্যাপারটা একই হবে, যতক্ষণ-না রহমত-সংক্রান্ত আয়াতকে আযাব-সংক্রান্ত আয়াত দিয়ে শেষ করেন অথবা আযাব-সংক্রান্ত আয়াতকে রহমত-

---

[৭৭] তায়ালিসি, আল-মুসনাদ : ২০২০; আবু আওয়ানা, আল-মুসনাদ : ৩১১২।

[৭৮] আহমাদ, আল-মুসনাদ : ৮৩৭২; এ ব্যাপারে অসংখ্য হাদীস বর্ণিত হয়েছে। এমনকি এটি মুতাওয়াতির পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। কুরআন সাত পাঠ-পদ্ধতিতে অবতীর্ণের ব্যাপারটি সর্বসম্মত। (অনুবাদক)

সংক্রান্ত আয়াত দিয়ে পাঠ শেষ করেন।

সুতরাং এমন অনেক হাদীস রয়েছে যেগুলো প্রমাণ করে যে, সাত পাঠপদ্ধতিতে কুরআন নাযিল করা হয়েছে এবং আল্লাহ তাআলার নামসমূহের মধ্য হতে 'বদল' হিসেবে কোনো একটা নাম দিয়ে পাঠ শেষ করার বৈধতা দেওয়া হয়েছে সেখানে পাঠক যে-কোনো একটি রীতিশৈলীর কিরায়াত দিয়ে পাঠ শুরু করতে পারে। অতএব নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে সেই সাতরীতির কোনো এক রীতিতে লেখার অনুমতি দিয়েছিলেন। দেখা যায় কখনও কখনও নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি আয়াত কোনো এক রীতিতে পাঠ করতেন কিন্তু সে নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলত, 'আমি কি এই রীতিতে অথবা ওই রীতিতে লিখতে পারি?' আর সে এটা বলতে পেরেছিল এ জন্যই যে, সে নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পক্ষ থেকে একাধিকবার বিভিন্ন পদ্ধতিতে লিপিবদ্ধ করার অনুমতি পেয়েছিল। ফলে নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে ভিন্ন কোনো রীতিতে লেখার অনুমোদন দিয়ে বলতেন, 'হ্যাঁ! এ দুটো তো একই।'

কেননা কুরআন একাধিক রীতিশৈলীতে নাযিল হয়েছিল, তাই তার পক্ষ থেকে ভিন্ন রীতিশৈলিতে লিপিবদ্ধ করাকে সমর্থন করেছিলেন। এরপর যখন জিবরীল আলাইহিস সালাম নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাথে প্রতি রমাদানে কুরআন দাওর করতেন অর্থাৎ একে অপরকে শুনাতেন, তখন আল্লাহ তাআলা কয়েকটি রীতিশৈলীকে মানসুখ (রহিত) করে দেন। সর্বশেষ দাওর হয়েছিল যায়িদ ইবনে সাবিত রাদিয়াল্লাহু আনহুর রীতিশৈলীতে। বর্তমানে মানুষ তাঁর পঠনশৈলীতেই কুরআন পাঠ করে। উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু-সহ অন্যান্য সাহাবগণ মুসলমানদেরকে এই পঠনরীতির ওপরই ওইক্যবদ্ধ করেন।

এ নিয়ে আরেকটি ব্যাখ্যা পাওয়া যায় যে—সে নবীজিকে বলত, আমি تعملون লিখব, নাকি تفعلون লিখব? নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বলতেন, যেটা ইচ্ছা সেটা লিখো।' তো আল্লাহ তাআলা তাকে সঠিকটিই লোখার তাওফিক দিতেন। আর উভয়টাই যদি নাযিলকৃত হত, তা হলে আল্লাহ তাআলার নিকট যেটা উত্তম তাকে সেটাই লেখার তাওফিক দিতেন। অথবা একমাত্র যেটা নাযিল হয়েছে সেটাই লেখার সুমতি দান করতেন।

নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই সুযোগটা তাকে দিতেন, কারণ একাধিক রীতিশৈলীতে কুরআন নাযিল হওয়ার কারণে সেটা বৈধ ছিল। তাই যত রীতিতে নাযিল হয়েছে সেগুলোর যে-কোনো এক প্রকারে লেখলেই হয়ে যেত। তা ছাড়া নবী সল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লামও সুদৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন যে, অবশ্যই আল্লাহ তাআলা কুরআনকে যে-কোনো ধরনের বিকৃতি থেকে হিফাযত করবেন। তিনি এটাও বিশ্বাস করতেন যে, সে ওইটাই লিখতে পারবে, যেটা আল্লাহ তাআলা নাযিল করেছেন। এর বাইরে সে কলম চালনা করতে পারবে না। আর এটা আমাদের এই পবিত্র গ্রন্থ—কিতাবুল্লাহর ব্যাপারে অজানা কোনো বিষয়ই নয়। কেননা আল্লাহ তাআলা গোটা কুরআনকে সব ধরনের বিকৃতি থেকে সুরক্ষার দায়িত্ব নিয়েছেন এবং তিনি এই সুরক্ষানীতিমালা ঘোষণা করেছেন যে, এই কিতাবের অগ্র-পশ্চাৎ কোনো দিক থেকেই ভ্রান্তি অনুপ্রবেশ করতে পারবে না।

আবার কেউ কেউ তৃতীয় আরেকটা মত বর্ণনা করেছেন যে, সে কখনও কখনও নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জবান থেকে কোনো একটি আয়াতের তিলাওয়াত শুনত, এভাবে শুনতে শুনতে পরিশেষে সেই আয়াতের কোনো এক বা ততোধিক শব্দ অবশিষ্ট থাকতেই নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা তিলাওয়াত করেছিলেন তার মর্মবাণী থেকে সে বুঝে নিত বাকিটুকু কী হতে পারে—যেমনটা অনেক বুদ্ধিমান বুঝতে পারেন। তখন সে নিজ থেকেই সেটা লিখে নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে শোনাত, নবীজি শুনে বলতেন, ‘হ্যাঁ! এভাবেই নাযিল হয়েছে।’

উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহুরও ঘটনাক্রমে এমন হয়েছিল। সদ্য-নাযিল-হওয়া আয়াতের কিছু অংশ নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পাঠ করেন। উমর ইবনুল খাত্তাব আয়াতের মর্ম অনুধাবনপূর্বক বলে ওঠলেন— فَتَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ। আর ঘটনাক্রমে সেটা আয়াতের অবশিষ্ট অংশের সাথে মিলে যায়।[৭৯]

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যা রাহিমাহুল্লাহ বলেন, এই ব্যাখ্যাগুলোর মধ্যে প্রথম ব্যাখ্যাটিই অধিক সঠিক ও যৌক্তিক।

• দশম হাদীস

দুই গায়িকার ঘটনার বিবরণ-সম্বলিত বর্ণনা, যারা নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিয়ে অশালীন গান গাইত। এদের সাথে বনু হাশিমের এক দাসির কথাও উল্লেখ আছে। ঘটনাটি ঐতিহাসিকদের নিকট প্রসিদ্ধ।[৮০] ফলে নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইবনে খাতালের এই দুই দাসীকে হত্যাদেশ জারি করেন। কেননা

---

[৭৯] তায়ালিসি, আল-মুসনাদ : ৪১

[৮০] ওয়াকিদি, আল-মাগাযি : ২/৮৫৯; ইবনে হিশাম, সিরাতুন নবী : ২/৪০৯-৪১০

এরা নবীজির ব্যাপারে নিন্দামূলক গান গাইত। একটাকে হত্যা করা হয়, আর অন্যটা কোথাও লুকিয়ে থাকে তাকে আমান বা নিরাপত্তা-প্রদানের আগপর্যন্ত। মুহাম্মাদ ইবনে আয়িয, ইবনে ইসহাক ও আব্দুল্লাহ ইবনে হাযম ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন।

বলা হয়ে থাকে, গায়িকা দুজন ইবনে খাতালের ছিল। ফলে নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার সাথে তার দুই গায়িকা দাসীকেও হত্যা করার নির্দেশ জারি করেন। এ বর্ণনার ব্যাপারে সিয়ার (ইসলামি যুদ্ধ-ইতিহাস) বিদ্বানগণ একমত পোষণ করেন এবং ঘটনাটি তাদের নিকট প্রসিদ্ধ।

এই ঘটনাটা দলিল হলো কীভাবে?

হ্যাঁ, আমরা বলছি যে, আসলি কুফর বা জন্মগতভাবে কাফের হওয়ার কারণেই কোনো নারীকে হত্যা করা বা হত্যা করার পরিকল্পনা করা বৈধ নয়—এটি সর্বসম্মত মাসআলা। এ ব্যাপারে নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সুন্নাহ ব্যাপক প্রসিদ্ধ। নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাফের নারী ও শিশুদেরকে হত্যা করতে নিষেধ করেছেন।[৮১]

সুতরাং আমরা বুঝতে পারলাম যে, নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে এই দুই গায়িকা নারীকে হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছিলেন সেটা মূলত (আসলি কুফর বা জন্মগত কুফরের কারণে নয়, বরং) নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কটূক্তি করা এবং তাকে নিয়ে নোংরা-ভাষায় গান করার কারণে। অতএব যে বা যারাই নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিয়ে কটূক্তি করবে বা গালমন্দ করবে সর্ব অবস্থায় তাকে হত্যা করা ওয়াজিব।

• একাদশতম হাদীস

মক্কা-বিজয়ের সময় নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শিরস্ত্রাণ মাথায় মক্কায় প্রবেশ করলেন। যখন তিনি মাথা থেকে শিরস্ত্রাণ খুললেন, তখন এক লোক এসে বলল, ইবনে খাতাল কাবার গিলাফ ধরে ঝুলে আছে (নিরাপত্তা প্রাপ্তির জন্য)। নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তাকে হত্যা করো।[৮২]

বর্ণনাটি খুবই প্রসিদ্ধ। বুখারী-মুসলিমে উল্লেখ আছে। তাকে হত্যার কারণ হলো,

---

[৮১] বুখারী, আস-সহীহ : ৩০১৪; মুসলিম, আস-সহীহ : ১৭৪৪

[৮২] বুখারী, আস-সহীহ : ১৮৪৬; মুসলিম, আস-সহীহ : ৩৩৭৪

নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে যাকাত উত্তোলনের জন্য নিয়োগ করেন। সঙ্গে আরেকজনকে নিয়োগ দেন তার সহযোগিতার জন্য। কিন্তু সঙ্গীটি তার জন্য খাবার প্রস্তুত না করায় সে বেজায় ক্ষেপে গিয়ে তাকে হত্যা করে ফেলে! পরে সে ভয় পেয়ে যায় যে, এ জন্য তো তাকেও হত্যা করা হতে পারে। ফলে সে মুরতাদ হয়ে সাদাকার মাল নিয়ে পালিয়ে যায়। সে নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর শানে কটূক্তিমূলক-কবিতা রচনা করত এবং তার দুই দাসীকেও আদেশ করত, তারা যেন সুর করে সেই কবিতাগুলো গায়। ফলে তার রক্ত হালাল হওয়ার জন্য একই সাথে তিনটি কারণ ছিল—

১. মুসলিম হত্যা করা

২. রিদ্দাহ বা ইসলাম ত্যাগ

৩. নবীজিকে কটূক্তি করা

তবে তাকে মুসলিম হত্যার দায়ে হত্যা করা হয়নি। কেননা যদি তাকে হত্যার বদলে হত্যা করা হত, তা হলে তাকে বনু খুযায়ার ওই লোকের ওলীদের কাছে তাকে অর্পণ করা হত, যাকে সে হত্যা করেছিল। তখন ওই লোকেরা তাকে হত্যা করত কিংবা তার কাছ থেকে মুক্তিপণ নিয়ে তাকে ক্ষমা করে দিত।

তাকে ধর্মত্যাগের কারণেও হত্যা করা হয়নি। কেননা মুরতাদ ব্যক্তির তাওবা গ্রহণ করা হয় এবং যদি সে অবকাশ চায় চিন্তা-ভাবনার জন্য, তা হলে তাকে অবকাশ দেওয়া হয়।

অথচ এই ইবনে খাতাল! সে নিরাপত্তার খোঁজে, যুদ্ধ ছেড়ে এবং অস্ত্র ফেলে গোপনে বাইতুল্লায় গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল। কিন্তু এতকিছু জেনেও নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে হত্যা করার নির্দেশ দেন। কোনো মুরতাদকে তো কেবল ইরতিদাদের কারণে এভাবে হত্যা করা হয় না। তাই আমরা বলব, তাকে হত্যা করা হয়েছিল নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিয়ে কটূক্তির কারণে।

• দ্বাদশতম হাদীস

নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (মক্কা-বিজয়ের পর) একদল লোককে হত্যার নির্দেশ দিয়েছিলেন তাঁকে গালমন্দ করার কারণে। কটূক্তির অপরাধে একদল লোককে তিনি হত্যা করেছেন, অথচ তিনি ওই সকল লোকদেরকেও ছেড়ে দিয়েছেন যারা তখনও কাফের ছিল এবং (মুসলিমদের বিরুদ্ধে) যুদ্ধে লিপ্ত ছিল। এ বিষয়ে পূর্বে

সাঈদ বিন মুসাইয়াবের রেওয়ায়েত বর্ণিত হয়েছে যে, নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কা-বিজয়ের দিন ইবনে জিবারাকে হত্যার আদেশ দেন। ইবনে ইসহাক ঘটনাটি উল্লেখ করে বলেন, নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন তায়িফ থেকে যুদ্ধ করে ফিরেন তখন বুজির ইবনে জুহাইর তার ভাই কাব ইবনে জুহাইরকে এই সংবাদ দিয়ে পত্র লিখেন যে, মক্কায় যারা নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে গালমন্দ করেছে এবং কষ্ট দিয়েছে, তিনি তাদের অনেককেই হত্যা করেছেন। কুরাইশ-কবিদের মধ্যে এখনও বাকি আছে ইবনে জিবারা ও হুবাইরা ইবনে আবি ওয়াহাব, এরা কোনো কোনো দিকে পালিয়ে গেছে। ইবনে জিবারা নাজরানে পালিয়ে যায়। পরবর্তীকালে সে যখন ইসলাম গ্রহণ করে এবং নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে উপস্থিত হয়। সে কিছু সুন্দর কবিতার মাধ্যমে তার তাওবা ও ওযর পেশ করে। এরপরও নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার রক্তকে মূল্যহীন ঘোষণা করেন। অথচ তিনি মক্কার অন্যান্য সবাইকে নিরাপত্তা প্রদান করেছিলেন, কিন্তু তার মতো অপরাধ যাদের, তাদেরকে তিনি ক্ষমা করেননি।

রাসূলুল্লাহ যাদেরকে হত্যার নির্দেশ দিয়েছেন তাদের মধ্যে ছিল—

- আব্দুল্লাহ ইবনে আবি উমাইয়াহ ইবনে মুগিরাহ
- আবু সুফিয়ান ইবনুল হারিস ইবনে আব্দুল মুত্তালিব

নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর শানে আবু সুফিয়ানের কটূক্তির ঘটনা খুবই প্রসিদ্ধ।[৮৩] আবু সুফিয়ান নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দুধভাই। নবীজির দুধ-মা হালিমাতুস সাদিয়াহ তাকেও দুধ পান করিয়ে ছিলেন। কিন্তু নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার রক্তকেও মূল্যহীন ঘোষণা করেন। কেননা সে নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাহাবাগণকে কষ্ট দিয়েছে এবং কটূক্তি করেছে।

(মক্কা-বিজয়ের দিন) তিনি এসে নিজের ব্যর্থতা ও ইসলাম গ্রহণের কথা প্রকাশ করেন। তিনি নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর চাচা আব্বাস, চাচাতো ভাই আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুম-সহ অনেকের দোহাই দিয়ে সুপারিশ গ্রহণের আকুতি জানাতে থাকেন। তিনি নবীজির কাছে এসে কবিতা আবৃত্তি করে নিজের ইসলাম গ্রহণ ও ওযর পেশ করতে থাকেন। একপর্যায়ে নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার প্রতি নরম হয়ে পড়েন। তখন সে আবৃত্তি করে বলে—

আপনার জীবনের শপথ! যেদিন আমি পতাকা উত্তোলন করি,

---

[৮৩] ওয়াকিদি, আল-মাগাযি : ২/৮০৬-৮১০

যেন লাতের বাহিনি আপনার বাহিনীকে পরাজিত করে!

সেদিনের আমি ছিলাম আঁধারচ্ছন্ন রাতে দিশেহারা পথিক। আজই সবে আমাকে হিদায়াত দেওয়া হচ্ছে এবং আমি হচ্ছি সুপথ-প্রাপ্ত।

একজন পথপ্রদর্শক আমাকে পথ দেখিয়েছেন, আমি নিজে পথ পাইনি। আমি যাকে একেবারেই তাড়িয়ে দিয়েছিলাম, সেই তিনিই আমাকে দেখিয়েছেন আল্লাহর পথ।

এভাবে সে বাকি কবিতাটুকু আবৃত্তি করে।

আরেক বর্ণনায়[৮৪] আছে—সে বলে, আমরা নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকটে প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা করি। কিন্তু তিনি অনুমতি দেন না। নবীজির স্ত্রী উম্মু সালামাহ রাদিয়াল্লাহু আনহা তখন নবীজির সাথে আব্দুল্লাহ ইবনে আবি উমাইয়াহ ও আবু সুফিয়ান ইবনুল হারিসের ব্যাপারে আলোচনা করেন। তিনি বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার জামাতা এবং আপনার ফুফুর ছেলে (আব্দুল্লাহ ইবনে আবি উমাইয়াহ), আপনার চাচার ছেলে এবং আপনার ভাই (আবু সুফিয়ান ইবনে হারিস)। আল্লাহ তাআলা উভয়কেই মুসলমান বানিয়েছেন। তারা যেন আপনার কারণে দুনিয়ার সবচেয়ে হতভাগা না হয়। আপনি তো এদের চেয়েও জঘন্য অপরাধীদের ক্ষমা করে দিয়েছেন। তা হলে এদের অপরাধ তো আপনি ক্ষমা করতেই পারেন। নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'সে আমার মানহানি করেছে, তাকে আমার প্রয়োজন নেই।'

আবু সুফিয়ানের কাছে যখন এই সংবাদ পৌঁছল, তার সাথে তখন তার ছেলে ছিল। সে বলতে লাগল, আল্লাহর শপথ! হয়তো তিনি আমাদের ওযর গ্রহণ করবেন, নয়তো আমি আর আমার ছেলে কোনো প্রান্তরে চলে গিয়ে পিপাসার যন্ত্রণায় মৃত্যুর আগপর্যন্ত ওখানেই থাকব। (তিনি এটা কীভাবে সহ্য করবেন?), তিনি তো সবচেয়ে মহান ও সবচেয়ে উদার। এতে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দয়াপ্রবণ হলেন। তখন তিনি তাদেরকে ভিতরে প্রবেশের অনুমতি দেন। তারা প্রবেশ করে এবং দুজনই ইসলাম গ্রহণ করে। পরবর্তীকালে তারা অনেক উত্তম মুসলমান হয়েছিলেন। পরবর্তিতে আব্দুল্লাহ ইবনে আবি উমাইয়াহ তায়িফের যুদ্ধে শহীদ হন আর আবু সুফিয়ান উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর খিলাফাতের সময় মদীনায় ইন্তেকাল করেন।

এই ঘটনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবু সুফিয়ান ইবনে হারিসের রক্তকে মূল্যহীন ঘোষণা করেন। অথচ অন্যদিকে কুরাইশদের বড়

[৮৪] ওয়াকিদি, আল-মাগাযি : ২/৮১০

বড় সরদার—যারা যুদ্ধের জন্য শক্তি জোগান দেওয়া, অর্থ সম্পদ জোগান দেওয়ায় আরও বেশি সক্রিয় ও তৎপর ছিল—তাদেরকে হত্যা করেননি। আসলে তাকে হত্যা করার কারণ হলো, সে নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে গালাগাল করত। সে মুসলমান হয়ে আসার পরও নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর অন্যতম মহৎ চরিত্র ছিল তিনি দূরের মানুষকেও কাছে টেনে নিতেন, তা হলে আত্মীয়-স্বজনের বেলায় তিনি হৃদয়ে কতটুকু ভালোবাসা ও সৌহার্দ্য লালন করতেন, চিন্তার বিষয়। তারপরও আল্লাহর নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার প্রতি এমন আচরণ করেছিলেন মূলত তার পক্ষ থেকে প্রকাশ-পাওয়া ঘৃণ্য আচরণের কারণে, যেমনটা হাদীসে তিনি ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

এমনিভাবে নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কা-বিজয়ের দিন ছয়জনকে তাদের নাম উল্লেখ করে কতলের নির্দেশ দিয়েছিলেন। তারা হলেন—ইবনে আবি সারহ, ইবনে খাতাল, হুওয়াইরিস, মিকইয়াস, ইকরামাহ ও হাব্বার।

এ ছয়জন সম্পর্কে বর্ণনা বেশ প্রসিদ্ধ। রাসূলের সীরাত ও মাগাযীর বর্ণনাকারীগণ এ ধরনের রেওয়ায়াত বর্ণনা করেছেন। তবে এগুলোর অধিকাংশ মুরসাল। মুরসাল রেওয়ায়াতও যখন বিভিন্ন সনদে বর্ণিত হয়, বিশেষত ওই সমস্ত ব্যক্তি থেকে বর্ণিত হয়, যাদের মুরসাল গ্রহণযোগ্য, তবে এগুলো মুসনাদ হাদীসের মতোই, বরং কখনও কখনও আহলুল-মাগাযির মাঝে প্রসিদ্ধ একটি মুরসাল রেওয়ায়াতও একটিমাত্র সনদে বর্ণিত হাদীস থেকেও শক্তিশালী।

এমনিভাবে উকবাহ ইবনে আবি মুআইতকে বেঁধে রেখে হত্যা করা হয়, তখন সে বলছিল, হে কুরাইশরা! আমাকে কেন এভাবে বন্দি করে হত্যা করা হচ্ছে? তখন রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'আল্লাহর সাথে কুফরি ও আল্লাহর রাসূলের ওপর মিথ্যা অপবাদের কারণে।'[৮৫]

এমনিভাবে নযর ইবনে হারিসকেও আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বন্দি করে হত্যা করেন, কেননা সেও নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে গালমন্দ করেছিল।

সুতরাং স্পষ্ট হয়ে গেল যে, বদরের যুদ্ধবন্দিদের মধ্য থেকে দুজনকে বিশেষভাবে হত্যার কারণ হলো কটূক্তি। কুরাইশ ও সমগ্র আরবের যারা নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিয়ে বিদ্রুপাত্মক কথা বলত, মক্কা-বিজয়ের পর নবী সল্লাল্লাহু

---

[৮৫] হাইসামি, মাজমাউয যাওয়ায়িদ : ১০০১৬

আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে হত্যার নির্দেশ দেন।

তেমনি এক জিন নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কটূক্তি ও বিদ্রুপ করেছিল। ফলে একজন শক্তিশালী মুসলিম জিন ওই জিনটাকে হত্যা করে ফেলে। পরবর্তীকালে নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মানুষজনকে এই ঘটনা শোনান।

এমনিভাবে ইহুদি আবু রাফি ইবনে আবিল হাকিকের ঘটনাও সহীহ বুখারীর প্রসিদ্ধ রেওয়ায়াত।

সুতরাং এই সকল হাদীস স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, যে লোক নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কটূক্তি করবে, তাকে হত্যা করা হবে এবং জনসমাজকে উৎসাহিত করা হবে তাকে হত্যা করার জন্য।

• ত্রয়োদশতম হাদীস

হাদীসটি ইমাম আবুল কাসিম আব্দুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ আলবাগাঙ্গী রাহিমাহুল্লাহ বর্ণনা করেছেন এবং আবু আহমাদ ইবনে আদি রাহিমাহুল্লাহ বর্ণনা করেছেন *আল-কামিল* গ্রন্থে।[৮৬]

মদীনা থেকে দুই মাইল অদূরে বনু লাইসের একটা গ্রাম ছিল। একলোক তাদেরকে একটি বিয়ের প্রস্তাব পাঠায় কিন্তু তারা প্রস্তাবটি নাকচ করে দেয়। তখন সে একটি বিশেষ পোশাক পরে তাদের কাছে আসে। সে এসে বলল, আল্লাহর রাসূল এই পোশাক পড়িয়েছেন এবং তোমাদের জান ও মাল-সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ে ফয়সালা গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেন। তারপর সে ওই নারীর কাছে যায়, যাকে সে ভালোবেসেছিল। তখন তারা (সত্যতা যাচাইয়ের জন্য) রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে লোক পাঠান। নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'আল্লাহর শত্রু মিথ্যা বলেছে।' তারপর তিনি একজন লোক পাঠিয়ে বলেন, 'যদি তুমি তাকে (জীবিত) খুঁজে পাও তা হলে তার গর্দান উড়িয়ে দেবে। আর যদি দেখো, সে মরে গেছে তা হলে তার দেহ আগুনে জ্বালিয়ে দিবে।'

তারপর তিনি এই হাদীসটি বলেন,

مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

---

[৮৬] ইবনে আদি, আল-কামিল : ৪/৫৩-৫৪

'যে ব্যক্তি আমার নামে ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা বলবে, সে যেন তার ঠিকানা জাহান্নামে বানিয়ে নেয়।'[৮৭]

হাদীসটির সনদ সহীহ। দুর্বলতার কোনো কারণ জানা যায় না। এ হাদীসের একটি শাহিদ হাদীস রয়েছে। নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দূতকে বলেছিলেন,

وَلَا تُحَرِّقْهُ بِالنَّارِ، فَإِنْ لَا يُعَذِّبُ بِالنَّارِ إِلَا رَبُّ النَّارِ

তাকে আগুন দিয়ে জ্বালিয়ো না, কেননা আগুন দিয়ে শাস্তি দেওয়ার অধিকার একমাত্র আগুনের রবের।[৮৮]

এই হাদীসটির ব্যাখ্যায় দুটি অভিমত :

✓ প্রথম অভিমত

হাদীসের বাহ্যিক দিক গ্রহণ করে বলতে হবে, যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নামে মিথ্যা-কথা ছড়াবে তাকে হত্যা করতে হবে। যে-সমস্ত ইমামগণ এ মত গ্রহণ করেছেন, তাদের মধ্যে কেউ কেউ বলেন, 'নবীর নামে ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা বলার দ্বারা ব্যক্তি কাফের হয়ে যায়।' এ মত গ্রহণকারীদের মধ্যে রয়েছেন ইমামুল হারামাইন আবু মুহাম্মাদ আল-জুওয়াইনি রাহিমাহুল্লাহ।

তাদের যুক্তি হলো, নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নামে মিথ্যা বলার অর্থ হলো আল্লাহ তাআলার নামে মিথ্যা বলা। তাই তো নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'আমার নামে মিথ্যা বলা আর তোমাদের কারও নামে মিথ্যা বলা একই কথা নয়।'[৮৯] কেননা রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আদেশ মূলত আল্লাহ তাআলারই আদেশ। তাই নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আনুগত্য করা ওয়াজিব, যেভাবে আল্লাহ তাআলার আনুগত্য করা ওয়াজিব। সুতরাং রাসূলুল্লাহর নামে মিথ্যাবাদী মূলত তাকে মিথ্যা-প্রতিপন্নকারীর মতোই।

বিষয়টি আরও স্পষ্ট করা যেতে পারে এভাবে :

রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মিথ্যা-প্রতিপন্ন করাও একপ্রকার মিথ্যা

---

[৮৭] তাহাবি, মুশকিলুল আসার : ৩৩২

[৮৮] ইবনে যাকারিয়া, আল-জালিসুস সালিহ : ১৪

[৮৯] বুখারী, আস-সহীহ : ১২৯১; মুসলিম, আস-সহীহ : ৪

বলা। কেননা নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মিথ্যা-প্রতিপন্ন করার অর্থ হলো, তিনি যে সকল সংবাদ নিয়ে এসেছেন সেগুলো সত্য নয় বলে ঘোষণা করা। আর এটা স্পষ্টভাবে আল্লাহর দ্বীনকে বাতিল বলার নামান্তর। তা ছাড়া নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নামে যে মিথ্যা বলবে, সে ইচ্ছাকৃতভাবে দ্বীনের মধ্যে এমন বিষয় ঢুকাল, যা দ্বীনের অংশ নয় এবং সে দাবি করে, তার কথা বিশ্বাস করা উম্মতের জন্য ওয়াজিব। এটা দ্বীনকে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ ও তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করারই নামান্তর। কেননা সে দাবি করছে, নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে বিষয়ে আদেশ করেছেন সেটা মূলত আদেশ করার মতো বিষয় না। এমনকি এ ব্যাপারে আদেশ করা কখনও কখনও বৈধ নয়। এ ধরনের কথা দ্বারা আল্লাহর সাথে নির্বুদ্ধিতাকে সম্পৃক্ত করা হয়, কিংবা এ দিকে ইঙ্গিত করা হয় যে, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাতিল বিষয়ে সংবাদ দিয়েছেন, এটা তো স্পষ্ট কুফরি।

মোটকথা, যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার নামে ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা বলবে, সে যেন ইচ্ছাকৃতভাবে আল্লাহ তাআলাকে মিথ্যা-প্রতিপন্ন করল, বরং তার অবস্থা আরও জঘন্য। তেমনিভাবে রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নামে মিথ্যা কথা বলা তাকে অস্বীকারের নামন্তর।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যা রাহিমাহুল্লাহ বলেন, জেনে রাখুন, 'এই অভিমতটি অত্যন্ত শক্তিশালী।'

তিনি এর পক্ষে এমন সব দলিল ও প্রমাণ পেশ করেছেন যেগুলো এতটাই মজবুত ও সংখ্যায় বিপুল যে, কোনোভাবেই খণ্ডন করা সম্ভব নয়।

এরপর ইবনে তাইমিয়্যা রাহিমাহুল্লাহ বলেন, এ দিকে লক্ষ করা জরুরি যে, সরাসরি মিথ্যা-প্রতিপন্ন করা আর ভিন্নভাবে মিথ্যা-প্রতিপন্ন করার মাঝে পার্থক্য আছে।

যেমন কোনো ব্যক্তি বলল, অমুকের ছেলে অমুক এই হাদীস নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে আমাকে বর্ণনা করেছে। যদি সে এভাবে বর্ণনা করে তা হলে সেই 'অমুক' ব্যক্তির নামে মিথ্যা বলল, সরাসরি নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নামে নয়। অর্থাৎ সে মাধ্যমের সাহায্যে নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নামে মিথ্যা বলল। আর যদি সে বলে, 'এটা সহীহ হাদীস' অথবা 'এটা নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে প্রমাণিত' এবং বর্ণনাকারী ভালো করে জানে, সে নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নামে মিথ্যা প্রচার করছে, তা হলে ধরা হবে সে সরাসরি নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নামে মিথ্যা-কথা প্রচার করল।

তবে যে ব্যক্তি নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নামে মিথ্যা প্রচার করতে অপ্রচলিত বর্ণনা বলে বেড়ায় তার ব্যাপারে মতানৈক্য আছে।

সুতরাং কেউ যদি তার শাইখের কাছ থেকে জেনেশুনে জাল হাদীস বর্ণনা করে, তা হলে কাজটা হারাম হবে। কিন্তু তাকে কাফের বলা যাবে না। তবে সে বর্ণনার মধ্যে যদি এমন কিছু অনুপ্রবেশ করায় যার দ্বারা তাকে কাফের বলা অপরিহার্য হয়ে ওঠে তবে ভিন্ন কথা। (তাকে কাফের বলা যাবে না), কেননা সে এ বিষয়ে সত্যবাদী যে, তার শাইখ তাকে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

আলোচ্য-হাদীসের ওপর ভিত্তি করে বলা যায়, যে নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে গালমন্দ করবে, সে ওই ব্যক্তির চেয়ে বেশি হত্যাযোগ্য যে নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নামে মিথ্যা কথা বলে। আর যে ব্যক্তি রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়ায়াসাল্লাম-এর নামে মিথ্যা বলেছে, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে কোনো প্রকার তাওবার সুযোগ দেওয়া ছাড়াই হত্যার আদেশ করেছেন। অতএব যে ব্যক্তি গালি দিবে সে তো আরও আগেই এই শাস্তির উপযুক্ত হবে।

✓ দ্বিতীয় অভিমত

নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নামে যে মিথ্যা বলবে, তাকে কঠিনতর শাস্তি দিতে হবে, তবে কাফের বলা যাবে না এবং তাকে হত্যা করাও বৈধ হবে না।

কেননা কুফরি ও হত্যার কারণগুলো সুনির্ধারিত। রাসূলের নামে মিথ্যা বলা সেসব কারণের অন্তর্ভুক্ত নয়। তাই যার কোনো ভিত্তি নেই সেটা সাব্যস্ত করা জায়েয হবে না। দ্বিতীয় মতটি যারা ব্যক্ত করেন, তাদের উচিত কথাকে অবশ্যই শর্তযুক্ত করা। অর্থাৎ তার এহেন মিথ্যা বর্ণনা দ্বারা যেন নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বাহ্যত কোনো ত্রুটি বোঝানো না হয়, এই শর্তটুকু সংযুক্ত করা।

তবে ঘোড়ার-ঘাম-সংক্রান্ত জাল হাদীস[৯০] ও এ-জাতীয় কুসংস্কারপূর্ণ যে কথাগুলো নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর শানে ত্রুটি হিসাবে চিহ্নিত হয়, সেগুলো যদি কেউ বর্ণনা করে বলে, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তবে সে তো রাসূলকে নিয়ে উপহাস করল। আর কোনো সন্দেহ নেই যে, এমন ব্যক্তি কাফের ও

---

[৯০] এটি প্রসিদ্ধ একটি বানোয়াট, ভিত্তিহীন বর্ণনা। ইমাম ইবনুল জাওযি তার প্রসিদ্ধ জাল হাদীস সংকলন আল-মাওযুয়াত গ্রন্থে (১/১০৫) সংকলন করেছেন। মুহাদ্দিসগণ বলেছেন যে, 'এটি বানোয়াট হওয়ার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। আর কোনো মুসলিমও এটি বানায়নি।'

তার রক্ত প্রবাহ বৈধ। শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যা রাহিমাহুল্লাহ এমনটাই উল্লেখ করেছেন।

সুতরাং ত্রয়োদশ হাদীসে উল্লিখিত ব্যক্তিটি মূলত আল্লাহর নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নামে এমন মিথ্যা-কথ্যা বলেছে যার দ্বারা নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কলঙ্কিত হন। কেননা এই লোক দাবি করেছে, আল্লাহর রাসূলই তাকে মানুষের জান-মালের বিচারক ও ফয়সাল বানিয়ে পাঠিয়েছেন এবং তাদের যার ঘরে ইচ্ছা রাতযাপনের অনুমতি দিয়েছেন, যেন সে তার কাঙ্ক্ষিত নারীর সাথে রাত কাটিয়ে তার সাথে পাপাচার করতে পারে।

আর যে ব্যক্তি দাবি করবে, নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হারামকে হালাল করেছেন সে মূলত নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কলঙ্কিত করল। সুতরাং এ কথা প্রমাণিত যে, উভয় অভিমত অনুযায়ী যে রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কলঙ্কিত করবে তাকে হত্যা করা হবে। এটাই এখানে মুখ্য আলোচ্য বিষয়।

তবে প্রথম ব্যাখ্যানুযায়ী লোকটা কাফের হবে, আর দ্বিতীয় ব্যাখ্যানুযায়ী কটূক্তিকারী হিসাবে গণ্য হবে। তবে দ্বিতীয় মতটি প্রথম অভিমতটিকে সমর্থন করে যে, যখন সাহাবাগণের সামনে কেউ নবীজির ব্যাপারে কোনো প্রকার মানহানি কিংবা কটূক্তি করত, তৎক্ষণাৎ সাহাবাগণ তা প্রতিহত করতেন।

• চতুর্দশ হাদীস

একজন বেদুইনের ঘটনা। নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে কিছু দান করেছিলেন, তখন সে নবীজিকে বলল, 'আপনি বণ্টন ঠিককরে ও সুন্দরভাবে করেননি।' তখন মুসলিমগণ তাকে হত্যা করতে উদ্যত হলে নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'তোমরা যদি তাকে হত্যা করতে তা হলে তো সে জাহান্নামে চলে যেত।'[৯১]

হাদীসটি প্রমাণ করে যে, যে ব্যক্তি নবীজিকে কষ্ট দেওয়ার দায়ে নিহত হবে সে জাহান্নামে যাবে। কারণ সে কুফরি করেছে এবং তাকে হত্যা করাও বৈধ। যদি তাকে হত্যা করা বৈধ না হতো তা হলে তো সে শহীদ হয়ে যেত!

---

[৯১] আবুশ শাইখ, আখলাকুন নবী : ১৭৭; সনদে ইবরাহীম ইবনুল হাকাম দুর্বল রাবী।

এই হাদীসে দেখা যায়, নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বেদুইনকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। কেননা নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যে কষ্ট দেয় তাকে ক্ষমা করে দেওয়ার অধিকার নবীর রয়েছে।

এ ধরনের আরেকটি কথা আছে। নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন হুনাইনের গনিমত বণ্টন করেন, তখন এক ব্যক্তি বলল, এ বণ্টনে আল্লাহর সন্তুষ্টি প্রত্যাশা করা হয়নি।' তখন উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছিলেন, 'আমাকে ছাড়ুন, আমি এই মুনাফিকের গর্দান উড়িয়ে দিই!'

হাদীসটি সহীহ মুসলিমে আছে। তবে নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকেও হত্যা করেননি। কেননা লোকজন বলাবলি করবে, মুহাম্মাদ নিজের অনুসারীদেরকে হত্যা করে! নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমনটাই বলেছিলেন।

আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই এ-জাতীয় কথা বলেছিল। (কুরআনে আছে, সে বলেছিল-)

لَئِن رَّجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ

> যদি আমরা মদীনায় ফিরি, তা হলে অবশ্যই অধিক মর্যাদাশীলগণ অপদস্থদেরকে মদীনা থেকে বের করে দিবে।[১২]

তখন উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছিলেন, 'আমাকে অনুমতি দিন, তার গর্দান উড়িয়ে দিই। নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'তা হলে তো তার পক্ষে অনেকে দাঁড়িয়ে যাবে।'

এটা ওই সময়ের ঘটনা যখন ইসলাম ছিল দুর্বল। ফলে আশঙ্কা ছিল, মানুষ ইসলামের প্রতি বৈরি হয়ে উঠতে পারে।

নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন, 'কে আছ, ওই ব্যক্তির ব্যাপারে সাহায্য করবে, যে আমার পরিবারকে পর্যন্ত কষ্ট দেয়?' তখন সাদ ইবনে মুআয রাদিয়াল্লাহ আনহু বলেন, 'আমি আপনাকে সাহায্য করব, সে যদি আওস গোত্রের হয় তা হলে আমি তার গর্দান উড়িয়ে দিব।' নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাদ বিন মুআযের এই কথা প্রত্যাখ্যান করেননি।[১৩]

---

[১২] সূরা মুনাফিকুন, ৬৩ : ৮

[১৩] বুখারী, আস-সহীহ : ৪১৪১; মুসলিম, আস-সহীহ : ২৭৭০।

• **পঞ্চদশ হাদীস**

সাইদ ইবনে ইয়াহইয়া আল-উমাবি তার *আল-মাগাযি* গ্রন্থে ইমাম শাবি রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণনা করেন, যখন নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কা বিজয় করেন তখন 'উযযা'র সম্পত্তিগুলোকে আনিয়ে নিজের সামনে ঢেলে দেন তারপর নাম ধরে একজনকে ডেকে তাকে কিছু দেন। তারপর আবু সুফিয়ান ইবনে হারবকে ডেকে সেখান থেকে কিছু দান করেন। তারপর সাঈদ ইবনুল হারিসকে ডেকে কিছু দান করেন। এরপর কুরাইশের কিছু লোককে ডেকে তাদের মধ্যে কিছু বণ্টন করে দেন। কুরাইশের একেকজনকে একেকটা স্বর্ণের বার দান করেন যার প্রত্যেকটার ওজন ছিল পঞ্চাশ থেকে সত্তর মিসকাল[৯৪] পর্যন্ত। তখন এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল, 'আপনি ভালোকরেই জানেন, আপনি সোনার বারগুলো কাদেরকে দিচ্ছেন!' দ্বিতীয়বার দাঁড়িয়ে সে একই কথা বলল। নবী সাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবারও তার দিকে মনযোগ দিলেন না। সে তৃতীয়বার দাঁড়িয়ে বলল, 'আপনি তো ফয়সালা করছেন, কিন্তু ইনসাফ দেখতে পাচ্ছি না। তখন নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'দুর্ভাগ্য তোমার! তা হলে তো আমার পরে আর কেউই ইনসাফ করতে পারবে না।'

এরপর নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবু বকরকে ডেকে বললেন, 'যাও! তাকে হত্যা কর।' কিন্তু তিনি গিয়ে তাকে আর পাননি। নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'তুমি যদি তাকে হত্যা করতে, আমি আশা করি—সেই হত 'তাদের' প্রথম ও শেষ।[৯৫]

এই হাদীসটি স্পষ্ট করে দিচ্ছে যে, এ ধরনের যারা নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অভিযোগ করবে তাদেরকে তাওবার সুযোগ না দিয়েই হত্যা করা হবে। এটি হুনাইনের গনিমত-বণ্টন-সংক্রান্ত ঘটনা নয়, বরং ভিন্ন আরেকটি ঘটনা। আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর পাঠানো স্বর্ণমুদ্রা-সংক্রান্ত ঘটনাটাও এটি নয়। 'উযযা' মূর্তিকে ভেঙে ফেলার ঘটনা ঘটেছিল মক্কা-বিজয়ের সময়, অষ্টম হিজরিতে। আর হুনাইনের ঘটনা ঘটেছিল মক্কা বিজয়ের পর যিলকদ মাসে। আর আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর স্বর্ণমুদ্রা পাঠানোর ঘটনা ঘটেছিল দশম হিজরিতে।

আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি যে, এক ব্যক্তি নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ফয়সালা মেনে না নেওয়ায় উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে হত্যা করেছিলেন। উমর

---

[৯৪] মিসকাল—আরবের বিশেষ একধরনের ওজন-পদ্ধতি। ১ মিসকাল = ৪.৩৭৪ গ্রাম।

[৯৫] শাইখুল ইসলাম বলেন, 'হাদীসটি মুরসাল। মুজালিদ ইবনে সাইদ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। তিনি লাইয়িনুল হাদীস (দুর্বল)। তবে অর্থগত দিক থেকে এর সমর্থনে আরও বহু হাদীস আছে।'

রাদিয়াল্লাহু আনহুর সমর্থনে কুরআনের আয়াত নাযিল হয়েছিল। অথচ সেই ব্যক্তির অপরাধ ছিল এই ঘটনায় উল্লেখিত ব্যক্তির অপরাধের চেয়ে অনেক লঘু।

আলী রাদিয়াল্লহু আনহু-এর পাঠানো স্বর্ণমুদ্রা রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বণ্টন করেছিলেন। আর সেই বণ্টন নিয়ে এক ব্যক্তি রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অভিযুক্ত করেছিল। এই ঘটনা বুখারী-মুসলিমে বিবৃত হয়েছে।

তখন নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন, 'এর ঔরসে এমন একদল লোক জন্মাবে, যারা কিতাবুল্লাহ পাঠ করবে তৃপ্তিভরে কিন্তু সেই তিলাওয়াত তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না। তারা দ্বীন থেকে এমনভাবে বেরিয়ে যাবে যেভাবে তির ধনুক থেকে বেরিয়ে যায়। তারা মুসলিমদের বিরুদ্ধে লড়াই করবে আবার মূর্তিপূজারিদেরকেও ছেড়ে দিবে। আমি যদি তাদেরকে পেতাম তা হলে আদ সম্প্রদায়ের মতো হত্যা করতাম।'[৯৬]

নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেন, 'শেষ জামানায় এমন কিছু লোকের আবির্ভাব হবে, যারা বয়সে হবে নবীন, জ্ঞান-বুদ্ধিতে হবে অপরিপক্ক, দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের মতো কথা বলবে, কিন্তু তাদের ইমান তাদের কণ্ঠনালি পর্যন্ত পৌঁছবে না। তারা দ্বীন থেকে এমনভাবে বেরিয়ে যাবে যেভাবে তির ধনুক থেকে বেরিয়ে যায়। তাদেরকে যেখানেই পাও হত্যা করো। কেননা যে তাদেরকে হত্যা করবে কিয়ামত-দিবসে সে তাদেরকে হত্যা করার প্রতিদান পাবে।'[৯৭]

এই সকল হাদীস প্রমাণ করে যে, রাসূলকে কটূক্তিকারী এই লোকটির দলবলকে রাসূল হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছেন, এবং নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জানিয়েছেন, তাদেরকে হত্যা করার মধ্যে রয়েছে হত্যাকারীর জন্য প্রতিদান। তিনি আরও বলেছেন, 'এরা হবে আকাশের নিচে সবচেয়ে জঘন্য নিহত-ব্যক্তি।'[৯৮]

তাদের দ্বীন থেকে বেরিয়ে যাওয়ার বিধান আরোপের পরেই তিনি হত্যার-বিধান আরোপ করেছেন। বোঝা গেল, তাদেরকে হত্যা করা আবশ্যক এ জন্যই যে তারা 'দ্বীন নিয়ে বাড়াবাড়ি করতে করতে দ্বীন থেকে বের হয়ে যায়।' এরা বিভিন্ন প্রকারের। আর এই লোকটাই হলো এদের 'প্রথম পুরুষ, যে নবীর যুগেই আত্মপ্রকাশ করে নবীজির বণ্টন নিয়ে আপত্তি তুলেছে।

---

[৯৬] বুখারী, আস-সহীহ : ৩৩৪৪; মুসলিম, আস-সহীহ : ১০৬৪।

[৯৭] বুখারী, আস-সহীহ : ৩৬১১; মুসলিম, আস-সহীহ : ১০৬৬।

[৯৮] আহমাদ, আল-মুসনাদ : ৫/২৫০; তিরমিযি, আস-সুনান : ৩০০০।

সুতরাং যে ব্যক্তি নবীজির কোনো সুন্নাহকে কলঙ্কিত করবে তার বিধান উপরিউক্ত ব্যক্তিদের বিধানের মতোই হবে। অতএব যে দাবি করবে যে, নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বণ্টন করতে গিয়ে জুলুম করেন, সে নবীজিকে মিথ্যা-প্রতিপন্ন করল। তার মতে তা হলে নবীর অনুসরণ আবশ্যক নয়। মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর রাসূল হওয়ার মাঝে যে অন্তর্নিহিত গুণগুলো রয়েছে, যেমন আমানতদারিতা এবং তাঁকে মান্য করা আবশ্যক হওয়া, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাজ ও কথা দিয়ে যত ফয়সালা করেন, কোনো ফয়সালায় নিয়ে অন্তরে দ্বিধা-সংশয় না রাখা ইত্যাদি, এ গুণগুলোর সাথে মিথ্যা-প্রতিপন্নকারীর বিশ্বাস সাংঘর্ষিক। কেননা আল্লাহর রাসূলের আনুগত্য করা আল্লাহ ফরয করেছেন আর তিনি কারও ওপর জুলুম করতে পারেন না। সতরাং যে এ বিষয়ে আপত্তি তুলবে, সে যেন রাসূলের রিসালাতের দায়িত্ব পালন নিয়েই আপত্তি তুলল। রাসূলের রিসালাত নিয়ে আপত্তি নিঃসন্দেহে নিকৃষ্ট ও জঘন্যতম কুফরি।

ইজমা থেকে প্রমাণ

সাহাবাগণ এই মাসআলায় ইজমা বা ঐকমত্য পোষণ করেছেন। কেননা এ-সংক্রান্ত বিভিন্ন ঘটনায় সাহাবাগণ থেকে একই রকম কথা ও মতামত বর্ণিত হয়েছে, কারও থেকেই ভিন্ন কোনো মত বা কথা সাব্যস্ত নেই। তাই বলা যায়, এ বিষয়ে সাহাবিগণের ইজমা সাব্যস্ত হয়ে যায়।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যা রাহিমাহুল্লাহ বলেন, জানা জরুরি যে, কোনো শাখাগত মাসআলায় সাহাবাগণের ইজমা আছে—প্রমাণ করার যত পদ্ধতি আছে সবগুলোর মধ্যে ওপরে বর্ণিত পদ্ধতিই উত্তম।[৯৯] এ-জাতীয় ঘটনায় সাহাবিগণের কিছু কর্মপদ্ধতি তুলে ধরা হলো।

১/

সাইফ ইবনে উমর আত-তামিমি বর্ণনা করেন। মুহাজির আল-মাখযুমি রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর সামনে দুজন গায়িকাকে আনা হলো। তাদের একজন নবীজিকে কটূক্তি করে গান গেয়েছিল। মুহাজির আল-মাখযুমি রাদিয়াল্লাহু আনহু তার এক হাত কেঁটে ফেললেন এবং তার সামনের দাঁতগুলো উপড়ে ফেললেন। আরেকজন মুসলমানদেরকে বিষদাগার করে গান গেয়েছিল। তিনি তার এক হাত কেঁটে ফেললেন এবং তারও সামনের দাঁতগুলো উপড়ে ফেললেন।

পরে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু মুহাজির আল-মাখযুমির নিকট পত্র লিখেন : 'যে নারী নবীজিকে কটূক্তি করে গান গেয়েছিল, তার বিষয়ে আপনার ফয়সালার সংবাদ আমার কাছে পৌঁছেছে। যদি আপনি আমাকে আগে জানাতেন, আমি আপনার প্রতি তাকে হত্যা করার নির্দেশ দিতাম। কেননা নবীদেরকে কটূক্তি করার শাস্তি অন্যান্য শাস্তির মতো নয়। এহেন কাজ কোনো মুসলিম করলে সে মুরতাদ, আর কোনো যিম্মি করলে সে বিশ্বাসঘাতক ও কতলের উপযুক্ত।

[৯৯] অর্থাৎ এ-জাতীয় ঘটনায় সকল থেকে একই ধরনের কথা বর্ণিত হয়েছে, কারো থেকে ব্যতিক্রম কথা আসেনি।

আর যে নারী মুসলিমদের প্রতি বিদ্বেষ-পোষণ করে গান গেয়েছিল, আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু পত্রে তার ব্যাপারে লিখেন : 'আমার নিকট এও সংবাদ এসেছে যে, মুসলিমদেরকে নিন্দা করে গান গাওয়ার অপরাধে আপনি এক নারীর হাত কেটে দিয়েছেন ও সামনের একটা দাঁত উপড়ে ফেলেছেন। সে যদি মুসলিম নারী হয়ে থাকে, তা হলে তাকে আদব শিক্ষা দেওয়া দরকার ছিল, তবে আদব শিখাতে গিয়ে শারীরিক বিকৃতি করা যাবে না। আর সে যদি যিম্মি হয়, তা হলে তো আপনি যে শিরক ক্ষমা করেছেন, তা আরও গুরুতর ছিল। এমন কোনো অপরাধ করে যদি আমি আপনার কাছে উপস্থিত হতাম তা হলে আমি আপনার নিন্দার উপযুক্ত হতাম। সহজতার নীতি অবলম্বন করুন, মানুষের দেহ বিকৃতকরণ থেকে বিরত থাকুন। অন্য কোনো অপরাধের কারণে অঙ্গবিকৃতি করা যাবে না। কেননা তা মানুষের মনে বৈরিতা সৃষ্টির উপকরণ, তবে কিসাসের বিধানের কথা ভিন্ন।'

সাইফ আত-তামিমি ছাড়াও অন্যরা ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন। উপরিউক্ত বর্ণনার সাথে তাদের বর্ণনার মিল রয়েছে। তবে তাদের বর্ণনায় এ কথাটুকুও আছে—'যে ব্যক্তি নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কটূক্তি করবে, তাকে হত্যা করা হবে তবে নবীজি ছাড়া অন্য কাউকে কটূক্তি করলে হত্যা করা যাবে না।'

হাদীসের ভাষ্য এই ব্যাপারে স্পষ্ট যে, যে-ই নবীজিকে গালি দিবে তাকেই হত্যা করতে হবে। মুসলিম গালি দিক কিংবা যিম্মি, কিংবা নারী—যেই হোক না কেন, তাকে তাওবা সুযোগ না দিয়েই হত্যা করা হবে। তবে অন্যান্যদেরকে গালি দিলে হত্যা করা হবে না। অন্যদেরকে গালি দেওয়ার শাস্তি যেমন বেত্রাঘাত, তেমনি নবীগণকে গালি দেওয়ার শাস্তি কতল।

তবে (উল্লেখিত) হাদীসে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু মুহাজির আল-মাখযুমি রাদিয়াল্লাহু আনহুকে এমন কোনো আদেশ করেননি যে, ওই মহিলাকে হত্যা করে ফেলতে হবে। কেননা মুহাজির আল-মাখযুমি রাদিয়াল্লাহু আনহু ইজতিহাদ করে ইতিমধ্যেই তাকে একটি শাস্তি দিয়েছেন। তাই আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু একই সাথে দুই ধরনের শাস্তি দেওয়াটা অপছন্দ করেছেন।

এও হতে পারে, কটূক্তিকারী ইসলাম গ্রহণ করেছিল কিংবা পূর্ব থেকেই মুসলিম হলে তাওবা করেছিল, আর আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর পত্র তাঁর হাতে পৌঁছার পূর্বেই মুহাজির রাদিয়াল্লাহু আনহু তার ইসলাম বা তাওবাকে গ্রহণযোগ্য বলে মেনে নিয়েছিলেন। ইজতিহাদ করে আগেই একপ্রকারের ফয়সালা হয়ে গেছে, তাই আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুও ইজতিহাদি ফয়সালাকে আর পরিবর্তন করেননি। কারণ

মূলনীতি হলো যে, একজনের ইজতিহাদকে অন্যজনের ইজতিহাদ দিয়ে প্রত্যাখ্যান করা যায় না।

২/

হারব আল-কিরমানি রাহিমাহুল্লাহ তাঁর *মাসায়িলু হারব লিল ইমাম আহমাদ* গ্রন্থে ইমাম লাইস থেকে বর্ণনা করেন, মুজাহিদ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কাছে এক লোককে নিয়ে আসা হলো। সে নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কটূক্তি করেছিল। উমর তাকে হত্যা করেন। তারপর তিনি বলেন, 'কেউ যদি আল্লাহ, তাঁর রাসূল অথবা কোনো নবীকে কটূক্তি করে, তা হলে তাকে হত্যা করো।'

মুজাহিদ রাহিমাহুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণনা করেন—'যদি কোনো মুসলিম আল্লাহ, তাঁর রাসূল অথবা অন্যকোনো নবীকে গালি দেয়, তা হলে সে অবশ্যই আল্লাহর রাসূলকে মিথ্যা-প্রতিপন্ন করল। আর আল্লাহর রাসূলকে মিথ্যা-প্রতিপন্ন করার অর্থ দ্বীন পরিত্যাগ। তাকে তাওবার সুযোগ দেওয়া হবে। যদি সে তাওবা করে তা হলে তার তাওবা গ্রহণ করা হবে, অন্যথায় তাকে হত্যা করা হবে। আর কোনো যিম্মি যদি কোনো নবীকে গালি দেয়, তা হলে সে তার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করল, তোমরা তাকে হত্যা করো।'

হারব আল-কিরমানি রাহিমাহুল্লাহ আরও বর্ণনা করেন যে, আন-নাবাতি নামক এক ব্যক্তি নবীজিকে গালমন্দ করেছিল। যখন উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু শামে প্রবেশ করেন তখন সে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর নিকট পত্র লিখেছিল। প্রত্যুত্তরে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে বলেন, 'আমরা তো তোমাকে এ জন্য নিরাপত্তা দিইনি যে, তুমি আমাদের বিরুদ্ধে গিয়ে আমাদেরই দ্বীনে নাক-গলাবে। তুমি যদি এ রকম কাজ আবার করো, তা হলে আমি তোমার গর্দান উড়িয়ে দিব!'

এই হলেন উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু! তিনি যাকে নিরাপত্তা দিয়েছেন, তাকে তিনি আনসার ও মুহাজির সাহাবিগণের উপস্থিতিতে বলছেন, 'আমরা দ্বীনে নাক-গলানোর জন্য তোমাকে নিরাপত্তা দিইনি।' (সাহাবিগণের উপস্থিতিতে) উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু কসম করে বলেছিলেন, 'সে যদি এ কাজ পুনরায় করে তা হলে তার গর্দান উড়িয়ে দিব।'

এখান থেকে বোঝা গেল, এ ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরামের ইজমা হয়ে গিয়েছিল যে, আমাদের দ্বীনের ব্যাপারে আপত্তি করার অধিকার কোনো যিম্মির নেই এবং দ্বীন নিয়ে

আপত্তি করলে যিম্মির রক্ত হালাল হয়ে যায়। আর সবচেয়ে বড় আপত্তি হলো নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কটূক্তি করা। এটা পরিষ্কার কথা, কোনো অস্পষ্টতা নেই।

ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা সম্পর্কে বর্ণিত যে, তিনি এক পাদরির পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন তাকে বলা হলো, এই পাদরি নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কটূক্তি করে। ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বললেন, 'আমি যদি শুনতাম, তা হলে তাকে কতল করতাম।'

একাধিক বর্ণনাকারী এই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর সাথে সাবিগের ঘটনা-সম্বলিত হাদীসটি ইতিপূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে। বিশেষ করে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা-সহ অন্যান্য উম্মুল মুমিনীনদের ব্যাপারে ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা-এর হাদীসও পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে।

এ ছাড়াও খালিদ ইবনে ওয়ালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর ব্যাপারে বর্ণিত আছে যে, তিনি এক নারীকে হত্যা করেছিলেন, কারণ সে নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কটূক্তি করেছিল। হাদীসটি ইমাম আহমাদ রাহিমাহুল্লাহ বর্ণনা করেছেন।[১০০]

আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক রাহিমাহুল্লাহ সনদ-সহ বর্ণনা করেন যে, এক নাসারা নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কটূক্তি করেছিল, আর গারাফা ইবনে হারিস আল-কিন্দি রাদিয়াল্লাহু আনহু-নামক জনৈক সাহাবি তা শুনেছিলেন। তখন তিনি আঘাত করে তার নাকের হাড্ডি গুড়ো করে ফেলেন। ফলে বিষয়টি আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কাছে উত্থাপিত হয়। তিনি গারাফা রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলেন, 'আমরা তো এদেরকে নিরাপত্তা দিয়েছি।' গারাফা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'আল্লাহর পানাহ! রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে গালি দেওয়ার পরও আমরা তাকে নিরাপত্তা দিব?' তখন আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, 'না! তুমি ঠিক বলেছ!'[১০১]

এই হলো সাহাবা ও তাঁদের একনিষ্ঠ তাবেয়ীগণের কিছু বক্তব্য। আল্লাহ তাআলা তাদের ওপর সন্তুষ্ট থাকুন।

---

[১০০] খাল্লাল, আল-জামি : ২/৩৪২।

[১০১] মূলত ঘটনাটি ঘটেছিল উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর সাথে। যথাসম্ভব এখানে ভুলক্রমে আমর ইবনুল আসের নাম এসেছে। (অনুবাদক)

কিয়াস থেকে প্রমাণ

কুরআন, হাদীস ও সাহাবি-তাবেয়ীদের বক্তব্য থেকে বিভিন্নভাবেই শিক্ষা নেওয়া যায়—

১/

আমাদের দ্বীনের দোষ-ধরা ও আমাদের নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিয়ে কটূক্তি করার অর্থ আমাদের বিরুদ্ধে জিহাদ ও যুদ্ধ ঘোষণা করা। হাত দ্বারা যুদ্ধ করলে যেমন নিরাপত্তা-চুক্তি ভেঙে যায়, মুখ দ্বারা আঘাতের দ্বারাও নিরাপত্তা-চুক্তি ভেঙে যাবে, বরং আরও আগেই ভাঙবে। আল্লাহ তাআলার নিম্নোক্ত বাণী আমাদের কথাকে আরও সুস্পষ্ট করে—

وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

'আর তোমরা আল্লাহর রাস্তায় তোমাদের জান ও মাল দ্বারা জিহাদ করো।[১০২]

জীবন দিয়ে জিহাদ দুভাবে হতে পারে—জিহ্বা দিয়ে ও হাত দিয়ে।

২/

আমরা যিম্মিদেরকে তাদের কুফরি বিশ্বাসসমূহের ওপর বহাল থাকার স্বীকৃতি দিয়েছি এ কথা মেনেই যে, তারা গোপনে আমাদের সাথে শত্রুতা রাখে। তবে তারা যদি প্রকাশ্যে আল্লাহ, রাসূল ও দ্বীনকে কটূক্তি প্রকাশ করে, তবে এটা যুদ্ধ ঘোষণার নামন্তর। এর ফলে নিরাপত্তা-চুক্তি ভেঙে যায়।

৩/

আমাদের মাঝে আর কাফেরদের মাঝে যদি কোনো সাধারণ নিরাপত্তা-চুক্তি সম্পাদিত হয় তা হলে এর অনিবার্য দাবি হলো— তারা যেভাবে চুক্তিবদ্ধ অবস্থায় রক্তপাত

---

[১০২] সূরা তাওবা, ৯ : ৪১

থেকে বিরত থাকে, সেভাবে তারা অবশ্যই আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের শানে কটূক্তি করা থেকেও বিরত থাকবে। বরং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে কটূক্তি করা আমাদের কাছে রক্তপাতের চেয়েও জঘন্য অপরাধ। কেননা রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সম্মান ও দ্বীনের বিজয়ের জন্য আমরা আমাদের জান-মাল বিলিয়ে দিই। আর আমাদের দ্বীনের এ বিষয়গুলো তারাও জানে। এরপরও যখন তারা এর অন্যথা করবে, তখন তাদের নিরাপত্তা-চুক্তি ভেঙে যাবে।

৪/

উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু কাফেরদের সাথে যে নিরাপত্তা-চুক্তি করেছিলেন সেখানেও তিনি এ শর্ত স্পষ্ট করে উল্লেখ করেছিলেন। এমনটাই বর্ণনা করেছেন হারব রাহিমাহুল্লাহ আব্দুর রহমান ইবনে গানম রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে সহীহ সনদে।

৫/

যিম্মিদের সাথে আমাদের চুক্তি হয় এই শর্তে যে, ভূখণ্ড আমাদের, এখানে ইসলামের বিধি-বিধান জারি থাকবে। যিম্মিরা অনুগত ও নমনীয় হয়ে। এসব শর্তেই তাদের সাথে চুক্তি ও সন্ধি হয়। এরপর তারা যদি রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কটূক্তি করে ও দ্বীনকে আঘাত করে কথা বলে, তা হলে এ আচরণ তাদের 'অনুগত ও নমনীয় হয়ে থাকা'র শর্ত পরিপন্থী।

৬/

রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সমর্থন করা, শক্তি জোগানো, সম্মান করা, সাহায্য করা, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখা, তাঁর প্রতি সম্মান প্রকাশ করা আমাদের জন্য ফরয। আল্লাহ (এসব দায়িত্ব) ফরয করেছেন। এ দায়িত্বের অপরিহার্য্য দাবি হলো সর্ব দিক থেকে রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখা।

৭/

রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সাহায্য করা আমাদের জন্য ফরয। কেননা তা আল্লাহর রাসূলকে শক্তি জোগানোর অন্তর্ভুক্ত। আর তা সর্বোত্তম জিহাদ। আল্লাহ তাআলা বলেন-

إِلَّا تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ

'যদি তোমরা রাসূলকে সাহায্য না করো, তবে আল্লাহ তাকে সাহায্য করেছিলেন...।'[১০৩]

বরং প্রতিটি মুসলিমকে সাহায্য করা ওয়াজিব, তা হলে শ্রেষ্ঠ আদম-সন্তান রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সাহায্য করার বিষয়টি কেমন হতে পারে।

৮/

কাফেরদের সাথে এ শর্তেই চুক্তি করা হয় যে, তাদের ধর্মের সাথে সম্পৃক্ত যে অন্যায় আছে, সেগুলো তারা প্রকাশ্যে করবে না। যদি তারা এগুলো প্রকাশ করে, তা হলে তাদেরকে শাস্তি ভোগ করতে হবে। তেমনিভাবে যদি তাদের থেকে রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি কটূক্তি প্রকাশ পায়, তা হলে তাদেরকে সাঁজা দেওয়া হবে।

৯/

মুসলিমদের মধ্যে এ ব্যাপারে কোনো মতবিরোধ নেই যে, যে-কোনো ধরনের কটূক্তি কাফেরদের জন্য নিষিদ্ধ। কেউ যদি নিষিদ্ধ কোনো কাজ করে তা হলে তাকে শাস্তি পেতে হয়। যেহেতু তাদেরকে কটূক্তির অধিকার দেওয়া হয়নি, তাই তারা যদি এমন অন্যায় করে যার আধিকার তাদেরকে দেওয়া হয়নি তা হলে তারা তো সর্বসম্মতিক্রমে শাস্তির উপযুক্ত হবে।

যিম্মিরা যদি কোনো সাধারণ মুসলিমকেও গালি দেয় তা হলে তাদেরকে বেত্রাঘাত করা হয়, সেখানে কেউ যদি রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কটূক্তি করে তা হলে তাকে হত্যা করা হবে।

১০/

স্পষ্ট কিয়াস ও যুক্তির দাবি হলো, যে বিষয়ে যিম্মি কাফেরদের সাথে চুক্তি হয়েছে, তার কোনো কিছু যদি তারা ভঙ্গ করে তা হলে তাদের চুক্তিও ভেঙে যাবে, যেমনটা কতিপয় ফকিহ বলেছেন।

যে বিষয়ে তারা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছে, তা যদি তারা পূর্ণ না করে তা হলে তো তাদের চুক্তি ভেঙে যাবে, যেমন বিক্রি-জাতীয় চুক্তিও ভেঙে যায় যদি দুই পক্ষের কোনো এক পক্ষ শর্ত পূরণ না করে। কারণটা স্পষ্ট। কেননা উভয় পক্ষের জন্য চুক্তি পূরণ করা

---

[১০৩] সূরা তাওবা, ৯ : ৪০

আবশ্যক এ শর্তেই যে, তারা উভয়েই শর্ত পূরণ করবে। যখন একজন সে শর্ত পূরণ না করে, তখন অপরের জন্য সেই চুক্তি পূরণ করা অপরিহার্য থাকে না। কেননা সকল বুদ্ধিমানের মতেই, শর্তযুক্ত কোনো কিছু তখনই অপরিহার্য হয় যখন শর্ত পূরণ হয়।

উপরিউক্ত মূলনীতিটি যদি স্পষ্ট হয়ে থাকে তা হলে আমরা বলব, চুক্তিকৃত বিষয়টা যদি কোনো একজন চুক্তিকারীর ব্যক্তিগত অধিকার হয় তা হলে তার অধিকার রয়েছে যে, সে অপর পক্ষ থেকে শর্ত পূরণ ছাড়াই চুক্তি পূরণ করবে। আর এ ধরনের ক্ষেত্রে শর্ত লঙ্ঘন হওয়ার দ্বারা চুক্তি ভেঙে যায় না, তবে তার ভাঙ্গার অধিকার থাকে। যেমন কেউ বাকিতে বিক্রি করার সময় ক্রেতাকে বন্ধক রাখার শর্ত জুড়ে দিল। (পরে ক্রেতা সেই শর্ত পূরণ না করলেও বিক্রেতার বিক্রির চুক্তি বহাল রাখার অধিকার আছে)

আর চুক্তিতে শর্তকৃত বিষয়টি যদি কারও ব্যক্তিগত অধিকার না হয়ে বরং আল্লাহর হক হয় বা কোনো বান্দার হক হয়, আর চুক্তিকারী কেবল তত্ত্বাবধানের অধিকার-বলে তাতে হস্তক্ষেপ করে, তা হলে চুক্তির শর্ত পাওয়া না গেলে চুক্তি ভেঙে যাবে কিংবা এই চুক্তি ভেঙে দেওয়া আবশ্যক হয়ে পড়বে।

উদাহরণ : কেউ কোনো নারীকে স্বাধীন ও মুসলিম হওয়ার শর্তে বিয়ে করল, কিন্তু পরে দেখা গেল, নারীটি মুর্তিপূজারি। (সেক্ষেত্রে বিয়ে ভেঙে যাবে, আলাদা করে বিয়ে ভাঙ্গার প্রয়োজন হবে না)

তেমনি (ইসলামি রাষ্ট্রে) কাফেরদের সাথে যিম্মি বা নিরাপত্তা-দানের চুক্তি করা মুসলিম নেতা বা খলিফার হক নয়, বরং এটা আল্লাহ তাআলা ও সমগ্র মুসলিম জনগণের হক। সুতরাং তারা যদি চুক্তির কোনো শর্ত লঙ্ঘন করে, তা হলে কেউ কেউ বলেন, ইমামের ওপর ওয়াজিব হবে সেই চুক্তি রহিত করা। আর রহিতকরণের স্বরূপ হলো, তাকে নিরাপত্তার সাথে ইসলামি রাষ্ট্র থেকে বের করে দেওয়া হবে। তবে এ মতটা দুর্বল। কেননা যিম্মিদের সাথে করা শর্তগুলো মূলত আল্লাহর হক। তাই খলিফা রহিত না করলেও তা রহিত হয়ে যাবে। আমাদের মূল আলচনা এটিই—যিম্মিদের সাথে শর্তকৃত বিষয়গুলো মূলত আল্লাহর হক। যদি মেনে নেওয়া হয়, তাদেরকে কোনো ধরনের শর্ত ছাড়াই ইসলামী ভূখন্ডে থাকতে দেওয়া হয়েছে, তবুও সে অধিকার ততটকুই যতটুকু অধিকার মুসলিমদের ক্ষতি না করে দেওয়া সম্ভব। যখন তাদের দ্বারা মুসলিমদের ক্ষতি হবে, তখন কোনো অবস্থাতেই তাদেরকে আর থাকতে দেওয়া হবে না। আর যদি মেনেও নেওয়া হয় যে, মুসলিমদের ক্ষতি হলেও তাদেরকে থাকার অনুমতি দেওয়া হবে, তবুও কোনোভাবেই জায়েজ হতে পারে না এবং মেনে নেওয়া যেতে পারে না যে, আল্লাহর হক লঙ্ঘন হলেও এবং দ্বীনের ক্ষতি হলেও আর তারা ইসলামকে

আঘাত করলেও তাদেরকে থাকতে দেওয়া হবে।

যিম্মির সাথে করা চুক্তির অপরিহার্য দাবি হলো তারা আল্লাহর রাসূলকে কটূক্তি করবে না। নিঃশর্ত বিক্রির চুক্তিতে যেমন- পণ্য দোষমুক্ত থাকা ও মূল্য নগদ হওয়া শর্ত তেমনিভাবে নিঃশর্ত বিয়ের চুক্তিতে সাধারণ কিছু বিষয় থেকে স্বামী-স্ত্রীকে মুক্ত থাকতে হয়, যেমন স্বাধীন হওয়া, মুসলিম হওয়া ইত্যাদি। কেননা এ-জাতীয় শর্ত স্পষ্ট করে করার প্রয়োজন হয় না, রীতিগতভাবেই বোঝা যায়।

একইভাবে কাফেরদের সাথে চুক্তি করার সময় যদিও আল্লাহর রাসূলকে কটূক্তি করা বা দ্বীনকে আঘাত-করা-সংক্রান্ত কোনো শর্ত না থাকে, তবুও জানা কথা, যিম্মিদের সাথে চুক্তির সময় মুসলিমদের উদ্দেশ্য এটাই থাকে যে, তারা কোনোভাবেই নবীকে কটূক্তি করতে পারবে না। যেমন : ধরে নেওয়া হয় যে, তারা মুসলিমদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে পারবে না। রাসূলকে কষ্ট না-দেওয়ার বিষয়টি আরও বেশি কাম্য। কেননা তা অধিক কষ্টদায়ক।

তবে কেউ যদি আপত্তি করে বলে যে, 'আমরা তো আবদ্ধ কাফেরদেরকে নিরাপত্তা দিয়েছি এ শর্ত মেনেই যে, তারা তাদের ধর্ম পালন করবে। আর (তাদের ধর্মের বিরোধী হওয়ায়) নবীজিকে গালমন্দ করা (হয়তো) তাদের ধর্মের অংশ!'

আমরা তাদের উত্তরে বলব, মুসলিমদের সাথে লড়াই করা, যে-কোনো পন্থায় তাদের ধন-সম্পদ ছিনিয়ে নেওয়া এবং মুসলিমদের সাথে শত্রুতা করাও তো তাদের ধর্মের অংশ। তাদের ধর্মের অংশ হলেও মুসলিমদের সাথে চুক্তি রেখে তারা এগুলো করতে পারে না। যখন তারা এ ধরনের কাজ করবে তখন তাদের চুক্তি ভেঙে যাবে। কেননা যদিও আমরা তাদেরকে থাকতে দিয়েছি এ কথা মেনে যে, তারা তাদের যা বিশ্বাস করার করবে এবং যা গোপন রাখার রাখবে, তাই বলে তাদের সেগুলো প্রকাশ করার এবং সেগুলো মুসলিমদের মাঝে বলার অধিকার আমরা দিইনি। তবে আমরা কারও নিরাপত্তা-চুক্তি ভাঙ্গার কথা বলি না যতক্ষণ-না আমরা তাদেরকে সেগুলো বলতে শুনব বা মুসলিমরা শুনে এর সাক্ষ্য দিবে। যখন আমরা শুনব বা তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য সাব্যস্ত হবে তখন ফয়সালা দেওয়া হবে, তারা কটূক্তি করেছে। যদি আমরা তাদেরকে (শর্ত ছাড়াই) তাদের ধর্ম মানার অধিকার দিই, তা হলে তো তাদেরকে মসজিদ ধ্বংস করার, কুরআন পুড়ানোর, আলেম ও সৎ-ব্যক্তিদেরকে হত্যা করার অধিকার দিতে হবে। কেননা তারা এগুলোকেও ধর্ম হিসাবে বিশ্বাস করে। কোনো বিরোধ নেই যে, তাদেরকে এসব অধিকার দেওয়া হবে না।

দ্বিতীয়

মাসআলা

কটূক্তিকারীকে হত্যা করতে হবে

রাসূলের কটূক্তিকারীকে হত্যা করতে হবে। তাকে বন্দি করে গোলাম বানিয়ে রাখা যাবে না বা বিনিময় নিয়ে ছেড়ে দেওয়া যাবে না, অথবা দয়া করে মুক্ত করে দেওয়াও যাবে না। এ সবই নাজায়েয। কটূক্তিকারী যদি মুসলিম হয়, তা হলে সর্বসম্মতভাবে তাকে হত্যা করতে হবে। কারণ সে হয় মুরতাদ, নয়তো যিন্দিক। আর মুরতাদকে তো হত্যাই করতে হয়। তার জন্য অন্য কোনো শাস্তি নেই। একইভাবে যিন্দিকেরও শাস্তি হত্যা। নারী কিংবা পুরুষ—উভয় মুরতাদ ও যিন্দিকের শাস্তি একই। আর কটূক্তিকারী যদি চুক্তিবদ্ধ কোনো কাফের হয়, তা হলে তার জন্যও হত্যা নির্ধারিত থাকবে। নারী-পুরুষের শাস্তির মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। এটিই সালাফদের অধিকাংশ ফকিহ ও তাদের অনুসারীদের অভিমত।

ইমাম ইবনুল মুনযিরের বক্তব্য আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি বলেছিলেন, আহলুল ইলমগণের সম্মিলিত মতামত হলো—যে ব্যক্তি নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে গালাগালি করবে, তার শাস্তি হলো হত্যা। ইমাম মালিক, লাইস, আহমাদ, ইসহাক-সহ শাফেঈ রাহিমাহুমুল্লাহরও অভিমত এটি। তবে ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণনা করা হয় যে, যিম্মিকে হত্যা করা যাবে না। কিন্তু ইমাম ইবনুল মুনযিরের বক্তব্য প্রমাণ করে যে, বেশিরভাগ ফকিহের মতামত হলো—যিম্মিকেও হত্যা করা ওয়াজিব। দুটি দিক লক্ষ রেখে কটূক্তিকারী যিম্মিকে হত্যা করা হবে :

১. গালমন্দের মাধ্যমে চুক্তি ভঙ্গ করার কারণে তার নিরাপত্তা-বিধান রহিত হয়ে যাওয়া,

২. কটূক্তির হদ্দ বা শরিয়ত নির্ধারিত সাজা হলো হত্যা। এটা মুহাদ্দিস ফকিহগণের অভিমত।

ইসহাক ইবনে রাহওয়াইহ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, নিরাপত্তা-চুক্তিতে আবদ্ধ কাফেররা যদি নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে গালামন্দ করে, তা হলে তাদেরকে হত্যা করা হবে। যারা বলে যে, গালি দেওয়ার কারণে তাদেরকে হত্যা করা যাবে না, তাদের

যুক্তি হলো—যে শিরক-কুফরে তারা লিপ্ত আছে, সেইটা নবীজিকে গালাগাল দেওয়ার চেয়ে আরও জঘন্য অপরাধ (অথচ এ অপরাধের কারণেও তাদেরকে হত্যা করা হয় না। তা হলে এরচেয়ে লঘু অপরাধে কী করে হত্যার বিধান জারি হতে পারে?)—যারা এ মত দিয়েছেন, তারা ভুলের মাঝে আছেন।

ইসহাক বলেন, তাদেরকে এ জন্য হত্যা করা হবে যে, গালি দেওয়ার মাধ্যমে তারা তাদের নিরাপত্তা-চুক্তি ভঙ্গ করেছে। উমর ইবনে আব্দুল আযিয রাহিমাহুল্লাহ বাস্তবে এমনটাই প্রয়োগ করে দেখিয়েছেন। আর এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই।

ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এক পাদরিকে হত্যা করেছিলেন (এ অপরাধের কারণে যে), সে নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে গালি দিয়েছিল। ইবনে উমর তখন বলেছিলেন, 'এ ব্যাপারে আমরা তাদের সাথে কোনো ধরনের আপস বা চুক্তি করি না।'

ইমাম আহমাদ রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, এমন ব্যক্তিকে হত্যা করা হবে এবং তার নিরাপত্তা-চুক্তি ভেঙে যাবে। পূর্বেই এ-জাতীয় কিছু বক্তব্য আলোচিত হয়েছে। এমনকি ইমাম আহমাদ রাহিমাহুল্লাহ-এর প্রায় সমস্ত অনুসারীও এই মতটিই উল্লেখ করেছেন এবং সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন জায়গায় তারা বিষয়টা আলোচনা করেছেন। তারা নবীজিকে গালমন্দকারী যিম্মিদেরকে অন্যান্য চুক্তি ও অঙ্গীকার ভঙ্গকারীদের মধ্যে উল্লেখ করেছেন।

পূর্ববর্তী ও পরবর্তী হাম্বলী আলেমদের একাংশ বলেন যে, গালিদাতা-সহ অন্যান্য অঙ্গীকার-ভঙ্গকারীদের নির্ধারিত শাস্তিই হলো হত্যা। আর ইমাম আহমাদের বক্তব্যও এটা প্রমাণ করে। তবে পরবর্তী আলেমদের একটা অংশ বলেন, যিম্মিদের মধ্য থেকে যারা চুক্তি ভঙ্গ করবে, খলিফাকে ওই সকল লোকদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্বাধীনতা দেওয়া হবে। যেমন যুদ্ধ-বন্দিদের ক্ষেত্রে খলিফার সিদ্ধান্ত-গ্রহণের স্বাধীনতা থাকে।

হাম্বলী মাজহাবের পরবর্তী আলেমদের এই বক্তব্যের ব্যাপক অর্থ গ্রহণ করলে (সমস্ত ধরনের) চুক্তি-ভঙ্গকারীদের মাঝে গালিদাতাও অন্তর্ভুক্ত। তবে কাযি আবু ইয়া'লা-সহ অন্যান্য মুহাক্কিক ইমামগণ উক্ত বক্তব্যকে 'গালিদাতা' ছাড়া অন্যান্য চুক্তি-ভঙ্গকারীদের জন্য প্রযোজ্য বলে মন্তব্য করেছেন। আর গালিদাতার জন্য তো হত্যা নির্ধারিত।

তাই গালিদাতার জন্য নির্ধারিত শাস্তি হলো হত্যা। এর বিপরীত কোনো বর্ণনা নেই।

কেননা যারা কোথাও চুক্তি-ভঙ্গকারী যিম্মির বিধান সাধারণভাবে বর্ণনা করেছেন, তারাই আবার অন্য কোথাও গালিদাতা যিম্মির বিধান আলাদাভাবে স্পষ্ট করে বর্ণনা করেছেন। তাই সাধারণ বর্ণনায় উল্লেখিত বিধানের মধ্যে সে অন্তর্ভুক্ত হবে না। অথবা এ সম্ভাবনাও আছে যে, গালিদাতার নির্ধারিত শাস্তি যে হত্যা, এ ব্যাপারে বিরোধপূর্ণ বর্ণনা আছে। কিন্তু বাস্তবে সেই বর্ণনা দুর্বল ও অগ্রহণযোগ্য। কেননা যারা এই মতকে সমর্থন করেছেন, তারাই আবার অন্য জায়গায় এর বিপরীত অভিমত উল্লেখ করেছেন।

ইমাম শাফেঈ রাহিমাহুল্লাহ-এর অনুসারীদের মধ্যেও ইখতিলাফ দেখা দিয়েছে। তাদের কেউ কেউ বলেছেন, কটূক্তিকারী-যিম্মির শাস্তি হত্যা। এটি নির্ধারিত। আবার কেউ কেউ বিপরীত মতও উল্লেখ করেছেন। তবে তাদের কাছে বিশুদ্ধ মত হলো—গালিদাতাকে হত্যা করা জায়েয (শাস্তি নির্ধারিত নয়)। তারা বলেন, কটূক্তিকারী-যিম্মি বন্দি (কাফেরের) মতোই। ফলে তার ব্যাপারে কল্যাণকর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার এখতিয়ার খলিফার আছে।

কিন্তু ইমাম শাফেঈ রাহিমাহুল্লাহ-এর বক্তব্যের মর্ম হলো, অঙ্গীকার-ভঙ্গকারীর বিধান ইসলামের বিরুদ্ধে চক্রান্তকারী (নির্দ্বিধায় হত্যার উপযুক্ত) কাফেরের বিধানের মতোই। অবশ্য আরেক জায়গায় তিনি বলেছেন, চুক্তি-ভঙ্গকারীকে নির্ধারিতভাবে হত্যা করতে হবে। এক্ষেত্রে খলিফার জন্য কোনো প্রকারের এখতিয়ার বা স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুযোগ নেই। তবে ইমাম আবু হানিফার মূলনীতি অনুযায়ী যিম্মিদের কটূক্তির কারণে তাদের চুক্তি বাতিল হয়েছে বলা যাবে না। কেননা তার মূলনীতি হলো—যিম্মি কাফেরদের ততক্ষণ পর্যন্ত চুক্তিভঙ্গ ধরা হবে না, যতক্ষণ-না তারা প্রভাব ও প্রতিপত্তিশালী হয়। যুক্তি হলো, সেক্ষেত্রে তারা খলিফার বিরুদ্ধে বেকে বসতে পারে, তখন তাদের ওপর আর আমাদের শাসন চলবে না।

ইমাম মালিক রাহিমাহুল্লাহ-এর মাজহাব হলো, যিম্মিদের নিরাপত্তা-চুক্তি ততক্ষণ ভঙ্গ হয় না, যতক্ষণ-না তারা আমাদের থেকে আলাদা হয়ে বের হয়ে যায় এবং আমাদের পক্ষ থেকে জুলুম করা ছাড়াই তারা জিযিয়া আদায় করা বন্ধ করে দেয়, কিংবা তারা কাফেরদের রাজ্যের সাথে গিয়ে মিলিত হয়। কিন্তু ইমাম মালিক রাহিমাহুল্লাহ গালিদাতার একমাত্র শাস্তি হত্যা বলে মতামত ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলেন, যিম্মি যদি কোনো স্বাধীন মুসলিম নারীকে ধর্ষণ করে, তা হলে তার শাস্তি হলো হত্যা। আর যদি মুসলিম দাসীকে ধর্ষণ করে, তা হলে ওকে ভয়াবহ ও কঠিনতম শাস্তি দিতে হবে।

সুতরাং রাসূলের কটূক্তিকারীদের শাস্তি কেবলই হত্যা, অন্যকিছু নয়। এটাই ইমামগণের অভিমত। ইমামগণের কেউ কেউ বলেন—চুক্তি-ভঙ্গকারীরা যতক্ষণ আমাদের কবজায়

থাকবে তখন তাদের একমাত্র শাস্তি হত্যা। কেউ কেউ বলেন—যে-সকল চুক্তি-ভঙ্গকারীর দ্বারা মুসলমানদের ক্ষতি হবে তাদের একমাত্র শাস্তি হলো হত্যা। যেমনটা ইমাম আহমাদ রাহিমাহুল্লাহ মতামত ব্যক্ত করেছেন এবং ইমাম শাফেঈ রাহিমাহুল্লাহ-এর বক্তব্যও যা প্রমাণ করে। কেউ কেউ বলেন—যে ব্যক্তি নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে গালি দিয়ে নিরাপত্তা-চুক্তি ভঙ্গ করবে তার শাস্তি হত্যা হবে অন্যকিছু নয়। যেমনটা কাযি আবু ইয়া'লা ও ইমাম শাফেঈর একদল অনুসারী উল্লেখ করেছেন।

যে-সমস্ত ইমামগণ নবীজিকে গালমন্দ করার বিধান (আলাদা করে উল্লেখ না করে) সাধারণভাবে অন্যান্য নিরাপত্তা-চুক্তি ভঙ্গ করার সাথে আলোচনা করে বলেছেন—নিরাপত্তা-চুক্তি ভঙ্গ করার সাজা দেওয়ার ক্ষেত্রে খলিফার অধিকার আছে যে, তিনি অপরাধীকে হত্যা করতে পারেন আবার অন্য কোনো সাজাও দিতে পারেন; তাঁরাও কিন্তু আবার অন্য জায়গায় স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলকে কটূক্তি করে চুক্তি ভঙ্গ করা হলে ইমামের কোনো স্বাধীনতা থাকবে না বরং এমন ব্যক্তির জন্য শাস্তিস্বরূপ হত্যাই নির্ধারিত থাকবে।

তবে যাঁরা বলেন যে, সর্বপ্রকার চুক্তি-ভঙ্গকারীর ক্ষেত্রে ইমামের স্বাধীনতা থাকবে, ইমামের ইচ্ছামতো শাস্তি প্রদান করার অধিকার থাকবে—তাদের এই কথার ব্যাখ্যায় আমরা বলেছি যে, মূলত তাদের বক্তব্যের উদ্দেশ্য হলো, খলিফা তাদের থেকে পরিপূর্ণ হক আদায় করে নিবেন। হত্যার উপযুক্ত হলে হত্যা করতে হবে। হদ্দ বা দণ্ডবিধির উপযুক্ত হলে দণ্ডবিধি লাগানো হবে। আর তাযির বা অন্যান্য শাস্তির উপযুক্ত হলে তাযির করবে। কেননা তাদের সাথে আমাদের নিরাপত্তা-চুক্তি হয়েছে এই শর্তের ভিত্তিতে যে, তাদের ওপর আমাদের শাসন প্রযোজ্য হবে। চুক্তি-ভঙ্গকারীর সাজাও আমাদের শাসনের অন্তর্ভুক্ত। যেহেতু আমাদের পূর্ণভাবে শাসনের অধিকার দেওয়া হয়েছে, সেহেতু ইমামকে (যথাযথ শাস্তি প্রদানের) অধিকার দেওয়া হবে। যেমনটা যুদ্ধ-বন্দির (ক্ষেত্রে দেওয়া হয়)।

তাঁদের এ বক্তব্যের ভিত্তিতে বলা যায় যে, কটূক্তিকারী-যিম্মিকে যে-কোনো প্রকারের দণ্ডবিধিই দেওয়া যাবে। যেমন : যিম্মিদের কেউ ব্যভিচার করল বা ডাকাতি করল, এক্ষেত্রে এই অপরাধের সাজা হিসেবে তাকে হত্যা করা ওয়াজিব হলে, তাকে হত্যাই করতে হয়। বরং যিম্মিকে চুক্তি-ভঙ্গ না করলেও (তার অন্য কোনো অন্যায়ের সাজা-স্বরূপ) হদ্দ বা দণ্ডবিধি দেওয়া যেতে পারে। যেমন : কোনো যিম্মি অন্য কোনো যিম্মিকে হত্যা করল। এক্ষেত্রে এক যিম্মি-কর্তৃক আরেক যিম্মিকে হত্যার দ্বারা নিরাপত্তা-চুক্তি ভঙ্গ না হলেও খুনি যিম্মিকে হত্যা করতে হবে।

ইমাম মালিক রাহিমাহুল্লাহ-এর অনুসারীদের মধ্যে থেকে কেউ যদি এ কথা বলে—কটূক্তির দ্বারা অঙ্গীকার ভঙ্গ হয় না, তা হলে তার বক্তব্যকে উল্লিখিত ব্যাখ্যার মাধ্যমে বিশ্লেষণ করলে আর কোনো বিরোধ থাকবে না। (অর্থাৎ চুক্তি ভঙ্গ না হলেও হত্যা করা যেতে পারে)

মোটকথা : খলিফা সিদ্ধান্ত দেওয়ার ক্ষেত্রে স্বাধীনতা রাখেন—বক্তব্যটি কিছু কিছু ফকিহগণের কথার ব্যাপক অর্থ থেকে অথবা শর্তহীন কথার মর্ম থেকে বোঝা যায়। এমনিভাবে খলিফাকে শাসনের পূর্ণাধিকার দেওয়া হবে—কথাটি তাদের এ কথা থেকেও বোঝা যায়—'নিরাপত্তা-চুক্তি ভঙ্গ করলে তাকে দারুল হরবে পাঠিয়ে দেওয়া হবে'।

সুতরাং ফকিহগণের ব্যাখ্যামুক্ত বক্তব্যকে গ্রহণ করলে তা মারাত্মক ভ্রান্তির দিকে ঠেলে দিবে। বরং তারা যে-সকল ক্ষেত্রে বিশ্লেষণ করে মত ব্যক্ত করেছেন, সেগুলো গ্রহণ করতে হবে। তারপরও যদি এ বিধানের বিষয়ে কোনো মতবিরোধ থেকে থাকে, তবে সেগুলোর বর্ণনাসূত্র দুর্বল ও কথার মর্মও সুনির্ধারিত নয়। আর রাসূলের কটূক্তিকারীর শাস্তি যে কতল বা হত্যা, সে দলিল তো আমরা ইতিমধ্যেই কুরআন, সুন্নাহ ও সাহাবিগণের ইজমার মাধ্যমে প্রমাণ করে দেখিয়েছি।

তৃতীয়

মাসআলা

কটূক্তিকারীকে তাওবার কোনো সুযোগ দেওয়া হবে না

নবীজির কটূক্তিকারীকে হত্যা করতে হবে। ওকে তাওবার কোনো সুযোগ দেওয়া হবে না। চাই সে মুসলিম হোক কিংবা কাফের।

হাম্বলী মাজহাব

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রাহিমাহুল্লাহ বলেন, যে ব্যক্তিই নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে গালি দিবে, তাকে হত্যা করা আবশ্যক। সে যে-ই হোক না কেন— মুসলিম ও কাফেরদের মধ্যে এই ক্ষেত্রে কোনো পার্থক্য নেই। আর এই জন্য তাকে তাওবারও কোনো সুযোগ দেওয়া হবে না।

কটূক্তিকারী যদি মুসলমান হয় তা হলে এতে সে মুরতাদ হিসেবে গণ্য হবে। আর যদি কাফের যিম্মি হয়, তা হলে এতে তার নিরাপত্তা-চুক্তি ভেঙে যাবে।

ইমাম আহমাদের জমহুর বা অধিকাংশ অনুসারীই অনুরূপ বলেছেন যে, এ ধরনের লোককে হত্যা করা হবে। তাকে তার কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হতে বলা হবে কিংবা তাকে তাওবা করতে বলা হবে—এই জাতীয় কথা তারা বলেননি। এমনকি যারা নবীর মায়ের ওপর অপবাদ আরোপ করবে, ওকেও অবিলম্বে হত্যা করার কথা তারা বলেছেন। তাকে তাওবার সুযোগ দেওয়ার কথা তারা বলেননি। আর যদি নবীজিকে গালমন্দ করার অপরাধ ছাড়া অন্য কোনো কারণে যদি কেউ মুরতাদ হয়ে থাকে, তা হলে তাকে তাওবার সুযোগ দেওয়া হবে। তবে সুযোগ দেওয়াটা কি ওয়াজিব না মুস্তাহাব, এ ব্যাপারে তাদের দুই ধরনের রেওয়ায়াতই আছে।

যদি কোনো মুসলিম নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে গালি দেয় এবং পুনরায় ইসলাম গ্রহণের মাধ্যমে তাওবা করে, অথবা যদি কোনো যিম্মি কটূক্তি করে আবার সেই কটূক্তি প্রত্যাহার করে নিরাপত্তা-চুক্তিতে ফিরে আসে, তবে তার তাওবা বা ফিরে-আসা গ্রহণযোগ্য হবে কি না, এ ব্যাপারে কাযি ইয়ায রাহিমাহুল্লাহ-সহ অনেকেই বলেন—যারা নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কটূক্তি করবে, তাদের তাওবা গ্রহণযোগ্য হবে না। কেননা, গালি দেওয়ার ফলে নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর যে অসম্মান করার, তা তো হয়েই গেছে। তাওবা করার ফলে তা দূরীভূত হবে না। ইবনে আকিলও অনুরূপ বলেছেন। তিনি বলেছেন, (কটূক্তির দ্বারা মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর হক লঙ্ঘন হয়েছে), যা বান্দার হক। তাওবার দ্বারা বান্দার হক রহিত হয় না। হাম্বলী মাজহাবের শীর্ষ আলেমগণ বলেন, কটূক্তিকারী তাওবা গ্রহণযোগ্য হবে না। তাওবা করলেও তাকে হত্যা করা হবে।

এক্ষেত্রে ভিন্নমত পোষণ করেছেন ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম শাফেঈ রাহিমাহুমুল্লাহ। তারা বলেন, গালিদাতা যদি মুসলিম হয় তা হলে তাকে তাওবা করতে বলা হবে। তাওবা করলে ভালো, অন্যথায় তাকে হত্যা করা হবে। আর যদি কটূক্তিকারী অমুসলিম বা যিম্মি হয়, তবে যিম্মি মুসলিম হলে তার নিরাপত্তা-চুক্তি ভাঙবে না। অবশ্য শাফেঈ মাজহাবের অনুসারীগণ এ মাসআলায় মতবিরোধ করেছেন।

শাফেঈ মাজহাবের নির্ভরযোগ্য একজন বর্ণনাকারী হলেন ইমাম শরিফ রাহিমাহুল্লাহ। *আল-ইরশাদ* নামক গ্রন্থে তিনি বলেন, 'যে ব্যক্তি নবীজিকে গালি দিবে তাকে হত্যা করা হবে। তাওবার সুযোগ দেওয়া হবে না। গালিদাতা যদি কাফের যিম্মি হয় এবং ইসলামও গ্রহণ করে, তবুও তাকে হত্যা করা হবে।'

আবু আলী ইবনুল রাহিমাহুল্লাহ বলেন, যে ব্যক্তি নবীজিকে গালি দিবে তাকে হত্যা করা ওয়াজিব। তার তাওবা গ্রহণযোগ্য হবে না। কাফের গালি দেওয়ার পর যদি ইসলাম গ্রহণ করে, তবুও মাজহাবের বিশুদ্ধ মত অনুযায়ী তাকে হত্যা করতে হবে। তাওবার কোনো সুযোগ দেওয়া হবে না।'

মালিকি মাজহাব

এ ব্যাপারে মালিকি মাজহাবও আমাদের মাজহাবের মতোই। তাদের মতেও কটূক্তিকারীকে হত্যা করা ওয়াজিব। চাই সে মুসলমান হোক বা কাফের। তাওবা, ইসলাম-গ্রহণ বা অন্য কোনো কিছুতে এ বিধান রহিত হবে না।

জামিউস সাগির গ্রন্থে কাযি ইয়ায রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, যে ব্যক্তি নবীজিকে গালি দিবে তাকে হত্যা করা হবে। তার তাওবা কবুল করা হবে না। তবে সে যদি কাফের হয় তা হলে তার ব্যাপারে দুই ধরনের বক্তব্য রয়েছে।

যে ব্যক্তি নবীজির মা-কে গালি দিবে—আবুল খাত্তাব রাহিমাহুল্লাহ ওই ব্যক্তির ব্যাপারেও অনুরূপ বিধানের কথা বলেছেন যে, ওকে হত্যা করা হবে। ওর তাওবা কবুল করা হবে না। যদি সে কাফের হয় তবে তার ব্যাপারে দুই রকম বক্তব্য রয়েছে।

ইমাম আহমাদ রাহিমাহুল্লাহ-এর কতিপয় সঙ্গী তাঁর থেকে ভিন্ন একটি মত বর্ণনা করেছেন যে, কোনো মুসলমান নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাকে গালি দেওয়ার পর তার কৃতকর্মের ওপর অনুতপ্ত হয়ে তাওবা করলে, তা গ্রহণ করা হবে। আবুল খাত্তাব এবং তাঁর অনুসারী কতিপয় পরবর্তী (মুতাআখখির) আলেম এমনটিই উল্লেখ করেছেন।

সারসংক্ষেপ

নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যে গালি দিবে, তার তাওবা গ্রহণ করা হবে কি না, এ ব্যাপারে ইমাম আহমাদ রাহিমাহুল্লাহ থেকে তিন ধরনের বর্ণনা রয়েছে।

১. গ্রহণ করা হবে না। এ বক্তব্যটিই দলিল-প্রমাণের দিক থেকে অধিক শক্তিশালী।

২. গ্রহণ করা হবে।

৩. এ বিধানের ক্ষেত্রে কাফের এবং মুসলমানের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। কাফেরের তাওবা কবুল হবে। মুসলমানের তাওবা কবুল হবে না। কাফের তাওবা করার অর্থ হলো, মুসলিম হয়ে যাওয়া। তা না হয়ে যদি গালি প্রত্যাহার করে এবং পুনরায় নিরাপত্তা-চুক্তির আবেদন জানায়, তবে তাকে নিরাপত্তা দেওয়া হবে না।

যে বর্ণনা অনুযায়ী মুসলমানের তাওবা গ্রহণযোগ্য হয়, সে বর্ণনা অনুযায়ী অমুসলিম যিম্মি গালি প্রত্যাহার করে নিলে, নিরাপত্তা-চুক্তিতে ফিরে আসার বৈধতাও সাব্যস্ত হয়। অথচ এর পক্ষে কোনো মনীষীর উদ্ধৃতি নেই।

আবুল খাত্তাবের বর্ণনা অনুযায়ী অমুসলিম যিম্মি ইসলাম গ্রহণ করলে তার হত্যা রহিত হবে। আর যারা বলেন, 'প্রতিটি কাফেরকে দাওয়াত দেওয়া ওয়াজিব' তাদের বক্তব্য অনুযায়ী অমুসলিম যিম্মিকে তাওবা করতে বলাও ওয়াজিব।

মালিকি মাজহাবের শীর্ষ আলেমগণ তাওবা গ্রহণযোগ্য হওয়া না-হওয়ার ব্যাপারে মুসলিম-অমুসলিমের মাঝে যে পার্থক্য বর্ণনা করেছেন ইমাম সামিরি রাহিমাহুল্লাহ তাঁর সম্পূর্ণ বিপরীত মত দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, মুসলমানের তাওবা গ্রহণযোগ্য হওয়া না-হওয়া উভয় বর্ণনাই আছে। তবে কাফেরের তাওবা যে গ্রহণযোগ্য হবে না, এ ব্যাপারে ভিন্ন কোনো বর্ণনা নেই। মূলত বিষয়টি এমন নয়। কেননা, এতে সন্দেহ নেই যে, কোনো মুসলমান পুনরায় ইসলাম গ্রহণ করে তাওবা করলে তা যদি গ্রহণযোগ্য হয়, তবে কোনো অমুসলিম ইসলাম গ্রহণ করে তাওবা করলে তা গ্রহণযোগ্য হওয়া আরও অধিক যুক্তিযুক্ত।

অতএ, শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তামিয়্যা রাহিমাহুল্লাহ বলেন, সামিরি রাহিমাহুল্লাহ যে পার্থক্য করেছেন, তার ব্যাখ্যায় বলা হয় যে, কদাচিৎ গালি যদি মুসলমান থেকে ভুলবশত প্রকাশ পায়—যা বিশ্বাসগত দিক থেকে নয়—তবে এটাকে তার কলম ও জবানের বিচ্যুতি ধরে তার তাওবা কবুল করা হবে। আর কাফেরের ক্ষেত্রে তা যদি নিঃসন্দেহে শুধু কষ্ট দেওয়ার উদ্দেশ্যে হয়, তবে এতে যখন তার ওপর হদ ওয়াজিব হবে তখন অন্যান্য হদের মতো ইসলাম-গ্রহণ করার ফলে তা রহিত হবে না।

মোদ্দা কথা

ইমাম আহমাদের প্রসিদ্ধ বর্ণনা-মতে, (কটূক্তি করলে) মুসলিম-অমুসলিম কাউকেই তাওবা করতে বলা হবে না। যদি সে স্বতঃস্ফূর্ত তাওবা করে তবুও তা কবুল করা হবে না।

তাঁর থেকে আরেকটি বর্ণনা আছে যে, যিম্মি স্বতঃস্ফূর্তভাবে ইসলাম গ্রহণ করলে তার থেকে হত্যা রহিত হয়ে যাবে। আরও একটি বর্ণনা আছে যে, মুসলমানকে তাওবা করতে বলা হবে। সে তাওবা করলে তার তাওবা গ্রহণ করা হবে।

এর ওপর কিয়াস করে বলা হয় যে, যিম্মিকেও তাওবা করতে বলা হবে। তবে কিয়াস সুদূর পরাহত।

গালি এবং অপবাদের মধ্যে বিধানগত পার্থক্য

হাম্বলী মাজহাব

হত্যা ওয়াজিব হওয়ার ক্ষেত্রে গালি এবং অপবাদের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট বক্তব্য রয়েছে ইমাম আহমাদ রাহিমাহুল্লাহ, তাঁর সকল সঙ্গী ও অধিকাংশ আলেমদের।

তবে আল্লামা ইবনে কুদামাহ রাহিমাহুল্লাহ অপবাদ ও গালির মধ্যে পার্থক্য করেছেন। নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ওপর অপবাদ আরোপ করার পর তাওবা করলে তার তাওবা কবুল হবে কি না, এ ব্যাপারে দুই ধরনের বক্তব্য উল্লেখ করেছেন। এরপর বলেছেন, অপবাদ আরোপ না করে যদি এমনিতেই তাঁকে গালি দেয় কিংবা তাঁর ব্যাপারে মন্দ কথা বলে, তা হলেও হুকুম অনুরূপই। অর্থাৎ, তাকে হত্যা করা ওয়াজিব। তবে সে যদি ইসলাম গ্রহণ করে, তা হলে তার হত্যার বিধান রহিত হয়ে যাবে।

এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা চতুর্থ মাসআলাতে করা হয়েছে।

মালিকি মাজহাব

মালিকি মাজহাব অনুসারে যে ব্যক্তি নবীজিকে গালি দিবে, তাকে হত্যা করা হবে। এ জন্য তাকে তাওবা করতে বলা হবে না। ইমাম মালিকের প্রসিদ্ধ মত হচ্ছে, কোনো মুসলমান নবীজিকে গালি দেওয়ার পর তাওবা করলেও, তার তাওবা গ্রহণযোগ্য হবে না। তার বিধান যিন্দিকের বিধানের অনুরূপ হবে। হদ বা দণ্ডবিধি বাস্তবায়ন করতে গিয়ে তাকে হত্যা করা হবে। কেননা, তাওবা করলেও হদ রহিত হয় না।

ইমাম মালিক রাহিমাহুল্লাহ থেকে আরেকটি বর্ণনা আছে যে, তিনি একে রিদ্দাহ তথা ধর্মান্তর সাব্যস্ত করেছেন। এর ওপর ভিত্তি করে তাঁর অনুসারীগণ বলেছেন,

মুসলিমকে তাওবা করতে বলা হবে। যদি তাওবা করে, তা হলে হত্যা করা হবে না। অন্যথায় হত্যা করা হবে। আর অমুসলিম-যিম্মি যদি নবীজিকে গালি দেওয়ার পর ইসলাম গ্রহণ করে, তা হলে তার ইসলাম-গ্রহণ হত্যা রহিত করবে কি না, এ ব্যাপারে দুই ধরনের বক্তব্যই রয়েছে।

শাফেঈ মাজহাব

শাফেঈ মাজহাবে নবীজিকে গালিদাতার ব্যাপারে দুটি বক্তব্য রয়েছে :

১. তার বিধান মুরতাদের বিধানের ন্যায়। তাওবা করলে হত্যা রহিত হয়ে যাবে।
২. তার হদ বা নির্ধারিত দণ্ডবিধি হচ্ছে হত্যা। যা কিনা কোনো অবস্থাতেই রহিত হবে না।

আবু বকর সাইদালালি রাহিমাহুল্লাহ তৃতীয় আরেকটি বক্তব্য উল্লেখ করেছেন যে, সেই গালি বা মন্দকথা যদি মিথ্যা অপবাদ হয়, তা হলে তার হুকুম রিদ্দাহ তথা ধর্মান্তরিতের ন্যায়। ধর্মান্তরের কারণে তাকে হত্যা করা হবে। যদি তাওবা করে, তা হলে হত্যা রহিত হয়ে যাবে। তবে অপবাদের শাস্তিস্বরূপ ৮০টি বেত্রাঘাত করা হবে। আর যদি তা অপবাদ না হয়, বরং স্রেফ গালি হয় তা হলে তাকে তার অবস্থা অনুপাতে শাস্তি দেওয়া হবে।

যারা বলেছেন নবীজিকে গালিদাতার কোনো প্রকারের তাওবা গ্রহণযোগ্য হবে না, শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যা রাহিমাহুল্লাহ তাদের পক্ষে বিস্তারিত দলিল-প্রমাণ উল্লেখ করেছেন এবং প্রতিপক্ষের দলিল-প্রমাণগুলো খণ্ডন করে সমুচিত জবাবও দিয়েছেন। (নবীজিকে গালিদাতার কোনো তাওবা গ্রহণযোগ্য হবে না) এই মর্মে কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াস থেকে এমন সব দলিল-প্রমাণ এনেছেন, যেগুলো খণ্ডন করার সাধ্য কারও নেই। যার কলেবর দেশীয় আটটি খাতা সমপরিমাণ হবে। বিস্তারিত জানতে শাইখুল ইসলামের সেই অমর গ্রন্থটি অধ্যয়ন করা যেতে পারে।

চতুর্থ

মাসআলা

রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কটূক্তি ও অন্যান্য কুফুরির মধ্যে পার্থক্য

মূল আলোচনা শুরু করার পূর্বে ভূমিকাস্বরূপ কিছু কথা উল্লেখ করা জরুরি মনে করছি।

আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে গালি দেওয়া প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য উভয় দিক থেকেই কুফরি।[১০৪] রাসূলের-কটূক্তিকারী কটূক্তি করাকে হারাম কিংবা জায়েজ, যা-ই জানুক না কেন; কিংবা আকীদার এ অধ্যয়টিতে বেখবর থাকুক না কেন, বিধান মূলত একই। আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাতের যে-সমস্ত ফকিহগণ ঈমানের সংজ্ঞায় বলেন : ঈমান হলো মুখে স্বীকৃতি ও আমলের সমন্বয়—এটি তাদের সকলের মত।

ইসহাক ইবনে রাহুয়াহ রাহিমাহুল্লাহ হলেন ফিকহের অন্যতম একজন ইমাম। তাকে ইমাম শাফেঈ ও ইমাম আহমাদ-এর সমপর্যায়ের গণ্য করা হয়। তিনি বলেন, ‘মুসলিমগণ এ বিষয়ে একমত হয়েছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ কিংবা তাঁর রাসূলকে কটূক্তি করবে কিংবা আল্লাহর নাযিলকৃত কোনো কিছুর বিরোধিতা করবে, সে কাফের। এমন ব্যক্তি আল্লাহর নাযিলকৃত সমস্ত কিছুকে মৌখিকভাবে স্বীকার করলেও কাফের।[১০৫]

একই কথা সুহনূন রাহিমাহুল্লাহ-ও বলেন। সুহনূন রাহিমাহুল্লাহ এ কথাও বলেন যে, তাদের কুফরি নিয়ে যে ব্যক্তি সংশয়-পোষণ করবে, সেও কুফরি করবে। এ বিষয়ে ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল রাহিমাহুল্লাহ, ইমাম শাফেঈ রাহিমাহুল্লাহ-সহ অন্যান্য কিছু ইমাম সুস্পষ্ট মত ব্যক্ত করেছেন। তাঁরা বলেন, যে-কেউ আল্লাহর কোনো একটি

---

[১০৪] প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য মানে এমন কাজ যে করবে, সে শুধু আল্লাহর কাছেই কাফের বলে গণ্য হবে না, তাকে প্রকাশ্যে কাফের ফাতাওয়া দেওয়া হবে।

[১০৫] ইসহাক আল-মারূযীও একই রকম কথা বর্ণনা করেন। তাযীমু কাদরিস সালাত : ২/৯৩০

আয়াতকে অবজ্ঞা করবে, সে কাফের হয়ে যাবে।[১০৬]

আমাদের সঙ্গীগণ ও অন্যান্যরাও একই কথা বলেন। তারা বলেন, যে ব্যক্তি—মজা করে অথবা বাস্তবেই—আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে কটূক্তি করবে, সে কুফরি করবে। এটিই বিশুদ্ধ কথা।

কাযি আবু ইয়া'লা বলেন, 'যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে কটূক্তি করবে তাকেই কাফের গণ্য করা হবে। কটূক্তিকারী কটূক্তিকে জায়েজ বিশ্বাস করুক কিংবা নাজায়েজ জানুক, (বিধান একই)।

আবু ইয়া'লার আরেক বর্ণনায় আছে, কটূক্তিকারী যদি বলে, আমি কটূক্তিকে জায়েজ বিশ্বাস করিনি, তবে (বিচারের ক্ষেত্রে) তার এ কথা গ্রহণ করা হবে না; বাহ্যিকভাবে তার থেকে প্রকাশ-পাওয়া কুফরির কারণে তাকে শাস্তি দেওয়া হবে। তবে ব্যক্তি যদি (তার দাবিতে) সত্যবাদী হয়ে থাকে যে, সে কটূক্তিকে জায়েয মনে করেনি তা হলে সে গুণগতভাবে মুসলিম (থাকবে), যেমনটি আমরা 'যিন্দিকে'র বেলায় বলেছি।

কাযি আবু ইয়া'লা এ বিষয়ে কতিপয় ফকিহগণের মত উল্লেখ করেন, তারা বলেন—নবীজিকে কটূক্তিকারী তার কটূক্তিকে জায়েয মনে করলে কাফের; আর যদি সে কটূক্তিকে জায়েয মনে না করে, তা হলে সাহাবিগণকে কটূক্তিকারীর মতো সে ফাসেক হবে, কাফের হবে না। কতিপয় ইরাকবাসী থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলকে যে কটূক্তি করবে তাকে বেত্রাঘাত করা হবে। ইমাম মালিক রাহিমাহুল্লাহ এ বর্ণনাকে মুনকার বলেন এবং তা প্রত্যাখ্যান করেন।[১০৭]

ইমাম ইবনে হাযাম রাহিমাহুল্লাহ বর্ণনা করেন, যারা রাসূলকে তুচ্ছজ্ঞান করে 'কতিপয় ব্যক্তি' তাদেরকে কাফের বলেন না।

কাযি ইয়ায ইরাকের 'কতিপয় ব্যক্তি'র এ ব্যতিক্রম মতটি এবং ইবনে হাযাম-উল্লেখিত মতবিরোধটি প্রত্যাখ্যান করেন। তারপর এ বিষয়ে তিনি একাধিক ব্যক্তির পক্ষ থেকে ইজমা (উম্মাহর ঐকমত্য) বর্ণনা করেন। তিনি ইরাকের কতিপয় ফকিহের ব্যতিক্রম মতটি সম্পর্কে মন্তব্য করেন, তা এমন কিছু ব্যক্তির অভিমত যারা ইলমের ক্ষেত্রে পরিচিতি পায়নি। তিনি তাদের মতটিকেও কয়েকভাবে ব্যাখ্যা করেন।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যা রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'কটূক্তিকারী যদি কটূক্তি

---

[১০৬] আশ-শিফা : ২/৩৯৩

[১০৭] আশ-শিফা : ২/৪১১

করাকে জায়েয বিশ্বাস করে, তা হলে সে কাফের; অন্যথায় কাফের নয়' বলে কতিপয় ফকিহ সম্পর্কে যে মতটি বর্ণিত হয়েছে, তা ভিত্তিহীন। কাযি আবু ইয়া'লা 'ইলমুল কালাম' শাস্ত্রের কতিপয় ব্যক্তির গ্রন্থ থেকে এ মতভিন্নতাটি উল্লেখ করেন। তারা এ মতটি ফকিহদের সম্পর্কে (নামে) উল্লেখ করেন। মতবিরোধের বর্ণনাটি বানোয়াট, যা তারা তাদের মূলনীতির ওপর ভিত্তি করে অনুমান নির্ভর হয়ে বলেছে। সুতরাং কেউ যেন না ভাবে যে, এই মাসআলায় মতবিরোধ রয়েছে। এটি নিছক একটি ভুল।

কটূক্তি ও কুফরির মাঝে পার্থক্য

বিষয়টি প্রমাণিত যে, সমস্ত কুফরি কটূক্তি নয়; তবে যে-সমস্ত কটূবাক্য ও গালিগালাজ রক্ত হালাল করে, তা কুফরি। আমরা কটূক্তি ও কুফরির বিভাজন নিয়ে আলেমগণের বক্তব্য নিম্নে তুলে ধরছি।

ইমাম আহমাদ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, যে ব্যক্তি রাসূলকে গালি দিবে এবং তাঁর ত্রুটি উল্লেখ করবে, তাকে হত্যা করা আবশ্যক এবং তাকে তাওবার কোনো সুযোগ দেওয়া হবে না।

তিনি আরও বলেন, যে ব্যক্তি কুরআনের সাথে সাংঘর্ষিক কোনো কথা বলে, তাকে হত্যা করা অপরিহার্য।[১০৮]

আমাদের সঙ্গীগণ বলেন, আল্লাহ ও রাসূলকে সুস্পষ্ট-ভাষায় কটূক্তি করার মতো ইঙ্গিতে কটূক্তি করার দ্বারাও মানুষ মুরতাদ হয়ে যায়।[১০৯]

আমাদের সঙ্গীদের মাঝে এ বিষয়ে মতভিন্নতা নেই যে, রাসূলের মায়ের নামে মিথ্যা অপবাদ আরোপ করা ওই সমস্ত কটূক্তির অন্তর্ভুক্ত, যা কতলকে আবশ্যক করে; বরং এটা আরও গুরুতর কটূক্তি।

কাযি ইয়ায বলেন, ওই ব্যক্তি রাসূলের কটূক্তিকারী বলে গণ্য হবে যে—

- রাসূলকে কটূক্তি করবে,
- তাঁর দোষ ধরবে,
- তাঁর নামে, তার বংশসূত্র ধরে, তাঁর দ্বীন অথবা তাঁর কোনো বৈশিষ্ট্যের সাথে ত্রুটি

---

[১০৮] আল-জামি : ২/৩৩৯

[১০৯] আল-ইনসাফ : ১০/৩৩৩

সম্পৃক্ত করবে,

- তাঁকে নিন্দা করবে,
- গালি দেওয়া, তাচ্ছিল্য করা, অবজ্ঞা করা বা দোষ ধরার মতো করে তাঁকে কোনো কিছুর সাথে তুলনা করবে।

এমন ব্যক্তি (কটূক্তি) স্পষ্ট করে বলুক কিংবা ইঙ্গিতে—তাকে হত্যা করা হবে। তেমনিভাবে যে ব্যক্তি রাসূলকে অভিশাপ দিবে, তাঁর জন্য ক্ষতি কামনা করবে, তাঁর বিরুদ্ধে বদদুআ করবে, অপমান করার উদ্দেশ্যে তাঁর শানের খেলাফ কোনো বিষয়কে তাঁর সাথে সম্পৃক্ত করবে, ওই ব্যক্তিকেও হত্যা করা হবে। একইভাবে যে ব্যক্তি রাসূলের শানে কোনো উপহাসমূলক, পরিত্যাজ্য, অন্যায় ও মিথ্যা কথা শুনে রাসূলকে সেসব কথা বলে দোষারোপ করবে, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ওপর দিয়ে অতিক্রান্ত বিপদ ও পরীক্ষার কথা বলে তাকে ত্রুটি যুক্ত করবে[১১০] কিংবা বৈধ ও মানবীয় ভুলের কারণে তাঁকে তাচ্ছিল্য করবে, সে ব্যক্তিও কাফের।

কাযি ইয়ায বলেন, এ বিষয়ে নবী মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর অনুসারী উলামা ও ইমামগণের ইজমা রয়েছে।

ইমাম মালিক রাহিমাহুল্লাহ বলেন, যে ব্যক্তি রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কটূক্তি করবে তাকে হত্যা করা হবে। তাকে তাওবার কোনো সুযোগ দেওয়া হবে না।

ইবনুল কাসেম রাহিমাহুল্লাহ 'কটূক্তি করবে'— কথাটির সাথে আরও যুক্ত করে বলেন—কিংবা যে ব্যক্তি তাঁকে গালি দিবে, দোষারোপ করবে, কিংবা তাঁর নামে কোনো ত্রুটি উল্লেখ করবে... এ ব্যক্তিকে যিন্দিকের মতো হত্যা করা হবে।[১১১]

মালিকি মাজহাবের কতিপয় ফকিহ বলেন, যে ব্যক্তি নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বিরুদ্ধে কোনো বদদুআ করবে তাকে তাওবার অবকাশ না দিয়েই হত্যা করা হবে।

কাযি ইয়ায কিছু কিছু ক্ষেত্র উল্লেখ করেন, যে ক্ষেত্রগুলোতে মালিকি মাজহাবের প্রসিদ্ধ একদল ফকিহের বক্তব্য অনুসারে—তাওবার অবকাশ না দিয়েই কটূক্তিকারীকে হত্যা করা হবে।

---

[১১০] যেমন কেউ বলল, যদি সে আল্লাহর রাসূল হয়, তবে কেন তার ওপর দিয়ে এ ধরনের বিপদ গেল?

[১১১] আশ-শিফা : ২/৩৯৫

প্রথম ধরন : একব্যক্তি কিছু মানুষকে রাসূলের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করতে শুনল। তখন সে দেখল, সেখান দিয়ে অসুন্দর দাড়িবিশিষ্ট কুৎসিত চেহারার এক লোক যাচ্ছে। তখন সে বলে উঠল—তোমরা রাসূলের আকৃতি জানতে চাও? তার রূপ হুবহু এই চলে-যাওয়া লোকটির মতো।

দ্বিতীয় ধরন : কোনো ব্যক্তি বলল, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কালো ছিল।

তৃতীয় ধরন : (কোনো এক বিষয়ে) কেউ কাউকে বলল, না! আল্লাহর রাসূলের হকের কসম! তখন সেই সম্বোধিত ব্যক্তি বলে উঠল, রাসূলের সাথেই তো আল্লাহ এমন এমন আচরণ করেছেন। (অর্থাৎ সে রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তুচ্ছ করে দেখল)

চতুর্থ ধরন : চাঁদাগ্রহণকারী একব্যক্তি কাউকে বলল, চাঁদা আদায় কর। (পারলে) রাসূলকে গিয়ে অভিযোগ কর।

পঞ্চম ধরন : কোনো এক বিতার্কিক তার বিতর্কের মাঝে রাসূলের শানে তাচ্ছিল্যভরে 'ইয়াতীম' ইত্যাদি শব্দ প্রয়োগ করল। সে দাবি করল যে, রাসূলের দুনিয়াবিমুখতা স্বেচ্ছায় ছিল না। তিনি যদি উত্তম উত্তম খাদ্য পেতেন, তা হলে তিনি তা গ্রহণ করতেন। ইত্যাদি ইত্যাদি কথা।

ইমাম শাফেঈ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি তাচ্ছিল্য প্রকাশ পায়—এমন প্রতিটি অভিব্যক্তি কটূক্তি বলে গণ্য হবে।

ইমাম আবূ হানিফা রাহিমাহুল্লাহ ও তাঁর সঙ্গীগণ বলেন, যে ব্যক্তি রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নামে কোনো ত্রুটিপূর্ণ কথা বলে, কিংবা রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাথে নিজেকে সম্পর্কছিন্ন ঘোষণা করে কিংবা রাসূলকে মিথ্যাপ্রতিপন্ন করে, সে মুরতাদ।[১১২]

সুতরাং এ বিষয়ে সকল উলামাগণের বক্তব্য একই—রাসূলের শানে কোনো ত্রুটিপূর্ণ মন্তব্য করা কুফরি; এর দ্বারা কটূক্তিকারীর রক্ত বৈধ হয়ে যায়। কটূক্তিকারীর উদ্দেশ্য যাই হোক! সে রাসূলের দোষ বলার উদ্দেশ্যে বলুক, কিংবা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে বলুক; সে রাসূলকে উপহাস করতে গিয়ে বলুক কিংবা কৌতুক করে বলুক। তবে এহেন কুফরিকারীকে তাওবার সুযোগ দেওয়া হবে কি না, এ নিয়ে আলেমগণের মাঝে

---

[১১২] মুরতাদের শাস্তি কতল।

মতবিরোধ রয়েছে। কেননা বান্দা যদি এমন কথাও বলে যা সে মন থেকে বলেনি[১১৩] তবু এমন কথার কারণে তাকে জাহান্নামের দুই মেরুর সমান গভীরে নিক্ষেপ করা হয়।

তা ছাড়া, যে ব্যক্তি (আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের শানে) কটূক্তিমূলক ও কলঙ্কজাতীয় কথা বলে, সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে কষ্ট দিল। আর (মূলনীতি হলো-) যে ব্যক্তি মানুষকে এমন কিছু বলে যা আসলেই কষ্টদায়ক, তবে তাকে কষ্ট দেওয়ার অপরাধে পাকড়াও করা হয়। বিষয়টি যদি এমনও হয় যে, সে কষ্ট দেওয়ার উদ্দেশ্যে কথাটা বলেনি, (তবুও তাকে পাকড়াও করা হবে)। আপনি কি আল্লাহর বাণী শোনেননি?

لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ

'আমরা তো শুধুমাত্র হাসি-তামাশা ও খেলা করছিলাম'।[১১৪]

যে ব্যক্তি রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ফয়সালা মেনে নেওয়া নিয়ে কারও সাথে বিতর্ক করে এবং রাসূলের শানে আজেবাজে কথা বলে, সে ওহির সুস্পষ্ট বক্তব্য অনুযায়ী কাফের। তার এ ধরনের কোনো ওজর গ্রহণ করা হবে না যে—প্রতিপক্ষকে প্রতিহত করাই আমার উদ্দেশ্য ছিল।

কেননা আল্লাহ তাআলা বলেন,

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ۝٦٥

> তোমার রবের কসম! তারা ততক্ষণ মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ-না তারা তোমাকে তাদের বিরোধপূর্ণ বিষয়ে বিচারক মেনে নেয়।[১১৫]

এ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত আরও কিছু কথা—যেমন একব্যক্তি বলেছিলেন, '(রাসূলের) এই বণ্টন দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করা হয়নি।[১১৬] আরেক সাহাবি (রাসূলকে)

---

[১১৩] বাস্তবিক অর্থে বলেনি।

[১১৪] সূরা তাওবা, ৯ : ৬৫।
এখানে আল্লাহ কিছু মুনাফিকের বক্তব্য তুলে ধরেছেন, যারা হাসিচ্ছলে কুরআনের আয়াত নিয়ে উপহাস করছিল। তারপরও আল্লাহ তাদের নিন্দা করেছেন। সুতরাং যে দুষ্টমির ছলে রাসূলকে গালি দিবে সেও হত্যার উপযুক্ত বলে গণ্য হবে।

[১১৫] সূরা নিসা, ৪ : ৬৫

[১১৬] কথাটি একজন সাহাবি অজ্ঞতাবশত রাসূলের শানে বলেছিলেন।

বলেছিলেন—ইনসাফ করুন, কেননা আপনি ইনসাফ করেননি।[১১৭] আরেক আনসারি ব্যক্তি (রাসূলকে) বলেছিলেন—যুবাইর বিন আওয়াম তো আপনার ফুফাতো ভাই।[১১৮] এগুলোও নিঃসন্দেহে সুস্পষ্ট কুফরি। তবে রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ক্ষমা করে দিয়েছেন। ইতিপূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি যে, একজন ব্যক্তি রাসূলের বিচার নিয়ে আপত্তি করেছিল, উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে হত্যা করেছিলেন। তখন উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর সমর্থনে আল্লাহ তাআলা কুরআনের আয়াত নাযিল করেছেন।

ইবনে আকীল-সহ শাফেঈ মাজহাবের কিছু কিছু ফকিহদের অভিমত হলো উপরিউক্ত ব্যক্তিদের শাস্তি ছিল তা'যীর; আর (শরিয়তে) তা'যীর করতেই হবে এমন নয়, এ জন্যই কারও কারও মতে রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে তা'যীর করেননি। অপরদিকে কারও কারও মতে, সেই ব্যক্তিকে শাস্তি দেওয়া ছিল রাসূলের হক। রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর হক ক্ষমা করে দিয়েছিলেন।

এ সবই অগ্রহণযোগ্য কথা। চিন্তাশীল ব্যক্তির সংশয় থাকার কথা না যে, সে কতলের উপযুক্ত ছিল।

কেউ কেউ (আপত্তি করে) বলতে পারে, যে সাহাবি রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বিচার নিয়ে আপত্তি করেছিলেন। এক বর্ণনা অনুযায়ী—তিনি তো বদর-যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবি ছিলেন। অথচ বদরের সাহাবির বিষয়ে এ ধরনের কথা সঙ্গত নয় যে, তিনি কুফরি করেছেন! তাদের আপত্তির জবাবে বলা হবে—তিনি যে বদর-যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবি ছিলেন- এ অংশটুকু আবুল ইয়ামান শুয়াইব থেকে বর্ণনা করেছেন। অধিকাংশ বর্ণনাকারীগণ তা বর্ণনা করেননি। সুতরাং এ অতিরিক্ত অংশটি 'অহম' অর্থাৎ অনিচ্ছাকৃত ভুল। যেমন এক হাদীসে আছে—কা'ব ও হিলাল ইবনে উমাইয়া বদর-যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। অথচ রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর যুদ্ধ ও সীরাত-বিশারদদের মাঝে এ বিষয়ে কোনো মতবিরোধ নেই যে, তারা বদর-যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেননি। এ জন্য ইবনে ইসহাক যুহরি থেকে তাঁর বর্ণনায় এ বিষয়টি উল্লেখ করেননি। অথচ বাহ্যিকভাবে তো হাদীসটি বিশুদ্ধ ছিল।[১১৯]

আপত্তিকারী সেই সাহাবি যদি আসলেই বদর-যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে থাকেন, তা হলে আমরা বলব, (আপত্তির) ঘটনাটি হয়তো বদর-যুদ্ধের পূর্বে ঘটেছে। তবুও তাকে

---

[১১৭] রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বণ্টন নিয়ে এক সাহাবি তাঁর উদ্দেশ্যে এই মন্তব্য করেন।

[১১৮] তিনি রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি পক্ষপাতিত্বের ইঙ্গিত দিয়ে কথাটি বলেছিলেন।

[১১৯] হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানীর মতে : তারা বদর-যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। ইবনুল কাইয়্যিমের মতে তিনি বদর-যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেননি।

হাদীসে বদরের সাহাবি বলা হয়েছে। কেননা ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু হাদীসটি বদর যুদ্ধের পর বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ ওই সাহাবি যখন বদরের সাহাবির পরিচয় লাভ করেছেন তার পরে। আর যদি ঘটনা বদর-যুদ্ধে অংশগ্রহণের পর হয়ে থাকে, তা হলে বলব—তিনি তাওবা করেছন। নিঃসন্দেহে তাওবা ও ইস্তিগফার পিছনের সমস্ত গোনাহ মুছে দেয়।

কটূক্তির তাওবা নেই, গোনাহের তাওবা আছে

আমাদের কাছে এটা প্রমাণিত হয়েছে যে, সরাসরি কিংবা ইশারা-ইঙ্গিতে রাসূলের শানে যে-কোনো ধরনের কটূক্তি(-র কারণে কটূক্তিকারীকে) কতল করা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। এখন আমাদের জন্য এটাও জানা জরুরি হয়ে পড়েছে যে, কটূক্তি ও সাধারণ কুফরির মাঝে পার্থক্য রয়েছে।

কটূক্তির প্রসংঙ্গটি কুরআন ও সুন্নাহতে «আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে কষ্ট দেওয়া» নামে আলোচিত হয়েছে। এক্ষেত্রে কোনো কোনো হাদীসে 'শাতম ও সাব্ব' শব্দ দুটি উল্লেখ আছে। তেমনি সাহাবি ও ফকিহগণের আলোচনাতেও শাতম ও সাব্ব শব্দ দুটি এসেছে।

অভিধানে যে শব্দের আলাদা কোনো সংজ্ঞা নেই[১২০] এবং শরীয়তেও যার বিশেষ কোনো সংজ্ঞা নেই,[১২১] সে ধরনের শব্দকে সাধারণ প্রচলিত অর্থে ব্যবহার করা হয়।[১২২] সুতরাং 'আযা'[১২৩], 'সাব্ব'[১২৪] ও শাতম'[১২৫]—এ শব্দগুলোর প্রচলিত অর্থের দিকে আমাদের মনোনিবেশ করতে হবে। সমাজের মানুষ যাকে সাব্ব তথা কটূক্তি বা ত্রুটি বা দোষ বা অপবাদ ইত্যাদি হিসাবে গণ্য করে তা-ই সাব্ব তথা কটূক্তি। তবে যে কুফরি এ-জাতীয় কথা নয় তা নিছক কুফরি, তা 'সাব্ব' বা কটূক্তি হবে না। (এখানে বিবেচ্য

---

[১২০] অভিধানে যে শব্দের আলাদা কোনো সংজ্ঞা আছে—আকাশ ও পৃথিবী

[১২১] শরীয়ায় যে শব্দের আলাদা সংজ্ঞা আছে—সালাত, যাকাত ও কুফর

[১২২] প্রচলিত অর্থে ব্যবহৃত শব্দ—কবজ ও হিরজ। কবজের শাব্দিক অর্থ : মজবুত করে ধরা। প্রচলিত অর্থ : মালিকানায় নিয়ন্ত্রণাধিকার অর্জন করা। হিরয অর্থ : বিরত থাকা। প্রচলিত অর্থ : সংরক্ষণ অর্থে ব্যবহৃত হয়।

[১২৩] কষ্ট দেওয়া

[১২৪] কটূক্তি করা, গালমন্দ করা

[১২৫] গালি দেওয়া

বিষয় হলো কোনটি রাসূলের জন্য 'সাব্ব' বা কটূক্তি হিসাবে গণ্য হবে। এমনও হতে পারে অন্যদের জন্য যে কথা স্বভাবিক, রাসূলের সম্মানে তাই সাব্ব বা গালি)। এ অনুযায়ী যে কথা নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছাড়া অন্যদেরকে বললে তাযীর বা হদ্দ অবধারিত হয়, সে কথা রাসূলের ক্ষেত্রে বললে সাব্বা বা কটূক্তি হয়ে যায়।

আর যে-সমস্ত কথার দ্বারা নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নবুওয়াতকে অবিশ্বাস করা বোঝায়, সেসব কথা যদি শুধুমাত্র নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নবুওয়াতকে অস্বীকারর অর্থেই ব্যবহৃত হয়, তবে সেগুলো নিছক কুফরি। আর যদি সেসব শব্দ অস্বীকারের অর্থ প্রকাশের সাথে সাথে তাচ্ছিল্যের অর্থও ধারণ করে তা হলে সেগুলো কটূক্তি বলে গণ্য হবে।

যিম্মি-ব্যক্তির কুফরি-কথা ও কটূক্তিমূলক কথার মাঝে পার্থক্য

জানা আবশ্যক যে, যিম্মি-ব্যক্তির কুফরি-কথা ও কটূক্তির মাঝে পার্থক্য রয়েছে। কেননা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অবিশ্বাস করার ফলে সর্বসম্মতিক্রমে তার কৃত-প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ হয় না এবং এর দ্বারা তার রক্তও বৈধ হয় না। তবে যিম্মি যদি আল্লাহ বা রাসূলকে কটূক্তি করে, এর দ্বারা তার 'নিরাপত্তা-চুক্তি' ভেঙে যায় এবং তার রক্ত প্রবাহও আবশ্যক হয়ে যায়। কাযি ইয়ায বলেন, (ইসলামি রাষ্ট্রে) যিম্মির নিরাপত্তা-বিধান দ্বারা তার কুফরিকে মেনে নেওয়া হয়, তাই বলে তার কটূক্তিকে নয়।

আমরা বলি, 'শাতেমে রাসূল'-এর বিষয়ে সাহাবা ও সালাফগণের যত 'আসার' বর্ণিত হয়েছে, সবই 'মুতলাক'। অর্থাৎ তাঁরা কোনো পার্থক্য করেননি যে, কটূক্তিকারী কি যিম্মি নাকি মুসলিম। তাঁরা এ বিষয়েও কোনো পার্থক্য করেননি যে, কটূক্তি কি একবারই করা হয়েছে নাকি বারবার, এবং প্রকাশ্যে নাকি অপ্রকাশ্যে। 'অপ্রকাশ্যে করা'র দ্বারা উদ্দেশ্য একদল মুসলিমের সামনে বলা। অন্যথায় (কটূক্তি সাব্যস্ত হওয়ার জন্য অন্তত দুজন মুসলিমের উপস্থিতি আবশ্যক)। কমপক্ষে দুজন মুসলিম সাক্ষ্য দিবে যে, আমরা তাকে কটূক্তি করতে শুনেছি কিংবা সে নিজেই কটূক্তির কথা স্বীকার করে নিবে। এ ছাড়া কোনো হদ্দ-ই প্রমাণিত হয় না। তবে যদি বিষয়টি এমন হয় যে, সে একাকী ঘরে রাসূলকে গালিগালাজ করল, কিন্তু তার মুসলিম প্রতিবেশীরা শুনে ফেলল অথবা কেউ কান পেতে শুনল, তা হলে ভিন্ন কথা। (দুজনের সামনে না বললেও তার কটূক্তি সাব্যস্ত হবে)

ইমাম মালিক ও আহমাদ রহিমাহুমুল্লাহ বলেন, মুসলিম হোক কিংবা কাফের, রাসূলকে

যে-ই কটূক্তি করবে অথবা খাটো করবে তাকেই কতল করা হবে। আমাদের ইমামগণও শর্তহীনভাবে বলেছেন, যে-ই রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হেয় করবে তাকেই কতল করতে হবে! হোক সে মুসলিম কিংবা কাফের।

কাযি ইয়া'লা ও ইবনে আকীল উল্লেখ করেন, যে-সমস্ত কথা একজন মুসলিম বললে ঈমান চলে যায়, সে-সমস্ত কথা কোনো যিম্মি জনসম্মুখে বললে 'আমান'[১২৬] ভেঙে যায়।

ইবনে আকীল বলেন, দ্বিত্ববাদ ও ত্রিত্ববাদের মতো যে-সমস্ত বিশ্বাস ঈমান ভেঙে দেয়, সর্বক্ষেত্রেই এ কিয়াসটি প্রযোজ্য। যেমন খ্রিষ্টানরা বলে—আল্লাহ তিনজনের একজন। এ ধরনের যে-সমস্ত বিশ্বাসকে যিম্মি তার ধর্ম হিসাবে জানে, সে-সমস্ত কথাও যদি সে প্রকাশ্যে বলে তা হলে তার 'নিরাপত্তা-চুক্তি' ভেঙে যায়।

কাযি ইয়া'লা বলেন, এ বিষয়ে ইমাম আহমাদের সুস্পষ্ট বক্তব্য রয়েছে—যে রবকে টিটকারি করে কিছু বলল, মুসলিম হোক কিংবা কাফের, তার অনিবার্য পরিণতি হত্যা। এটিই মদীনার আলেমগণের মাজহাব।[১২৭]

এক ইহুদি ব্যক্তি মুয়াযযিনের আযান শুনে বলল, তুমি মিথ্যা বলেছ। এ ব্যক্তি সম্পর্কে ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল রাহিমাহুল্লাহ বলেন, তাকে হত্যা করতে হবে। কারণ সে 'শাতম' বা কটূক্তি করেছে।[১২৮]

ইবনুল কাসিম বলেন, যে ব্যক্তি বলবে—মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নবী বা রাসূল নয়, কিংবা তাঁর ওপর কুরআন অবতীর্ণ হয়নি বরং কুরআন শুধুমাত্র তাঁর মুখের কথা, সে কটূক্তি করল। তাকে হত্যা করা জরুরি। আর যে বলবে—সে আমাদের রাসূল নয়, সে শুধু মুসলিমদের রাসূল। অথবা আমাদের নবী শুধু মূসা ও ঈসা, তাকে কিছু বলা হবে না (কারণ সে তার ধর্মীয় বিশ্বাস প্রকাশ করেছে)।[১২৯]

আর যদি সে বলে, আমাদের ধর্ম মুহাম্মাদের ধর্ম থেকে উত্তম তা হলে তাকে শায়েস্তা করা হবে এবং দীর্ঘদিন কারাগারে বন্দি রাখা হবে। এটি মুহাম্মাদ বিন সুহনূন রাহিমাহুল্লাহ-এর অভিমত। তিনি এ মতটি তাঁর পিতার বলে উল্লেখ করেন। (তিনি আরও বলেন) যিম্মি যে বিশ্বাসের কারণে কাফের, সেই কথাগুলো যদি সে স্বাভাবিকভাবে বলে, তা

[১২৬] ইসলামি রাষ্ট্র-কর্তৃক যিম্মিকে প্রদত্ত নিরাপত্তা।

[১২৭] আস-সারিম : ৯৮

[১২৮] আল-জামি : ২/৩৩৯

[১২৯] আশ-শিফা : ২/৪৮৫

হলে তাকে হত্যা করা হবে না। আর যদি সে কটূক্তি করে বলে, তা হলে তাকে হত্যা করা হবে। তবে যদি সে ইসলাম গ্রহণ করে (তা হলে ভিন্ন কথা)।[১০০]

মুয়াযযিন আযানে তাশাহহুদ বলছিলেন। তখন মুয়াযযিনের উদ্দেশ্যে এক ইহুদি বলল, 'তুমি মিথ্যা বলেছ'। এ ব্যক্তি সম্পর্কে মুহাম্মাদ বিন সুহনূন বলেন, তাকে শাস্তি দিতে হবে এবং জেলে ভরতে হবে। অবশ্য পূর্বে আলোচিত হয়েছে—এ ধরনের একটি সুরতে ইমাম আহমাদ কতলের কথা বলেছেন, কেননা তা 'শাতম' বা কটূক্তি।

একইভাবে আমাদের মত অনুযায়ী যেসব কটূক্তির দ্বারা যিম্মির আমান বা নিরাপত্তা শেষ হয়ে যায় এবং তাকে হত্যা করতে হয়, সে-সমস্ত ক্ষেত্রে শাফেঈ ফকিহগণ দুটি মত দিয়েছেন—

১. তাদের অধিকাংশের মত হলো রাসূলের শানে যে-কোনো ধরনের কটূক্তিমূলক কথা এবং আমাদের দ্বীন নিয়ে যে-কোনো ধরনের আক্রমণাত্মক কথা প্রকাশ্যে বলার দ্বারাই 'আমান' শেষ হয়ে যাবে।

২. যদি তারা প্রকাশ্যে তাদের ধর্মীয় বিশ্বাস হিসাবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নামে কিছু বলে, যেমন—মুহাম্মাদ রাসূল নয় কিংবা কুরআন আল্লাহর কালাম নয়, তবে সেগুলো ইসলাম বহির্ভূত তাদের অন্যন্য ধর্মীয় কথার মতোই হবে। যেমন—ঈসা আলাইহিস সালাম ও ত্রিত্ববাদে বিশ্বাস-সংক্রান্ত কথা। তারা বলেন, কোনো সন্দেহ নেই যে, এ-জাতীয় কথা বলার দ্বারা 'আমান' ভঙ্গ হবে না, বরং তাদেরকে প্রকাশ্যে বলার কারণে 'তাযীর' বা সাধারণ শাস্তি দেওয়া হবে। আর যদি তারা এমন কোনো কথা বলে, যা তাদের ধর্মীয় বিশ্বাস নয়—যেমন আল্লাহর রাসূলের বংশ নিয়ে অপবাদ দেওয়া ইত্যাদি—তবে তাদের নিরাপত্তা-চুক্তি ভেঙে যাবে। এটিই সায়দালানী, আবুল মাআলী ও অন্যান্যদের মত।

বিভিন্ন দলিল দ্বারা এ কথা প্রমাণিত যে, সব ধরনের কটূক্তির বিধান একই। যে-কোনো ধরনের কটূক্তির শাস্তি হত্যা, যিম্মি সেগুলো ধর্ম হিসাবে বিশ্বাস করুক কিংবা না-ই করুক। পূর্বে এ বিষয়ে পর্যাপ্ত আলোচনা হয়েছে। কেননা মানুষ যা কিছু বিশ্বাস করে, সেগুলো বলেই আল্লাহ বা তাঁর রাসূলের নিন্দা করে, দোষারোপ করে। বিভিন্ন দলিল দ্বারা এ কথা প্রমাণিত যে, সর্বধরনের কটূক্তির বিধান একই—যে-কোনো ধরনের কটূক্তির শাস্তি হত্যা, যিম্মি সেগুলো ধর্ম হিসাবে বিশ্বাস করুক কিংবা না করুক। পূর্বে এ বিষয়ে পর্যাপ্ত আলোচনা হয়েছে। কেননা মানুষ যা কিছু বিশ্বাস করে, সেগুলো

[১০০] আশ-শিফা : ২/৪৮৬

বলেই আল্লাহ বা তাঁর রাসূলের নিন্দা করে, দোষারোপ করে, এ সত্ত্বেও তাদেরকে হত্যার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

তা ছাড়া, যদি আমরা বলি, যে কথা তারা দ্বীন হিসাবে বিশ্বাস করে না, এমন কথাই কেবল কটূক্তি হবে, তা হলে সবাই কটূক্তি করে বলবে, এটা আমরা দ্বীনি-বিশ্বাস। সে ক্ষেত্রে আমরা বলব, রাসূলের কটূক্তির উদাহরণ টানা এবং কটূক্তির ধরণ উল্লেখ করা আমাদের অন্তর ও জিহ্বার জন্য বড় কঠিন। এগুলো আমাদের কাছে এত গুরুতর যে, আমরা এগুলো মুখেও আনতে পারি না। কিন্তু আলোচনার প্রয়োজনে এ প্রসঙ্গে কথা বলা। সুতরাং (কোনো ধরনের উদাহরণ ও ধরন উল্লেখ ছাড়াই) আমরা কোনো বিশেষণ ছাড়াই সমস্ত ধরনের কটূক্তিই কথা বলছি। আর ফকিহও এ বিষয়ে আলোচনায় সতর্কতা অবলম্বন করেন। আমরা বলব—

কটূক্তি দুই প্রকার : বিবৃতিমূলক কটূক্তি ও দুআর মাধ্যমে কটূক্তি

• **দুআর মাধ্যমে কটূক্তি :** যেমন কেউ কাউকে বলল, আল্লাহ 'তাকে' লানত করুন, আল্লাহ তাকে বিশ্রী করুন, আল্লাহ তাকে লাঞ্ছিত করুন, আল্লাহ তাকে দয়া না করুক, আল্লাহ তার বংশ নির্মূল করুক। এ-জাতীয় কথা শধু নবীগণ নন, যে-কারও ক্ষেত্রেই কটূক্তি হিসেবে গণ্য হবে। আর দ্বীন, দুনিয়া বা আখিরাতের অপকার নিহিত আছে—এমন যে-কোনো দুআ যদি কোনো মুসলিম বা যিম্মি বলে, তবে তা কটূক্তি হিসাবে গণ্য হবে। যেমন কেউ রাসূলকে উদ্দেশ্য করে বলে, যে আল্লাহ তাঁর ওপর সালাত ও সালাম বর্ষণ না করুন, আল্লাহ তাঁর আলোচনা বুলন্দ না করুন, আল্লাহ তাঁর নামকে নিশ্চিহ্ন করুন।

রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর শানে এ-জাতীয় কটূক্তি কোনো মুসলিম করলে তাকে সর্বাবস্থায় হত্যা করতে হবে আর কোনো যিম্মি যদি জনসম্মুখে বলে, তবে তাকেও হত্যা করা হবে।

কখনও এমন হয়—কেউ বাহ্যত দেখায় রাসূলের জন্য দুআ করছে, আর মনে মনে রাসূলের জন্য বদদুআ করে। সে যে বদদুআ করছে, এটা তার বাচনভঙ্গি থেকে বোঝা যায়, আবার সবাই বোঝেও না যে, সে বদদুআ করছে, বরং কেউ কেউ বোঝে আর কেউ কেউ বোঝে না। যেমন : কেউ সম্ভাষণের মতো করে 'আস-সামু আলাইকুম' বলল, কম্ভ সাধারণত যে-কেউ বুঝবে, সে 'আস-সালামু আলাইকুম বলেছে।[১৩১] এ ধরনের ক্ষেত্রে দুটি মত আছে।

[১৩১] আস-সামু আলাইকুম মানে তোমার প্রতি ধ্বংস। আস-সালামু আলাইকুম মানে তোমার প্রতি শান্তি

১. এটি কটূক্তি হিসাবে গণ্য হবে এবং কটূক্তিকারীকে হত্যা করা হবে। এক ইহুদি এই ধরনের সম্ভাষণ করার পরও রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন, কেননা ইসলাম তখন ছিল দুর্বল আর রাসূলের প্রতি আদেশ ছিল তখন সব ক্ষমা করে দেওয়ার। এটি মালিকি, শাফেঈ ও হাম্বলী মাজহাবের একদল ফকিহের মত।

২. এটা এ ধরনের কটূক্তি নয়, যার দ্বারা নিরাপত্তা-চুক্তি বাতিল হয়ে যায়, কেননা তারা কটূক্তি প্রকাশ করেনি এবং প্রকাশ্যেও বলেনি। তারা বাহ্যিক অবস্থা ও শব্দ দিয়ে সম্ভাষণ ও সালাম প্রকাশ করেছে, আর সালামের মাঝে বিদ্যমান 'লাম' অক্ষরটিকে আত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে উহ্য রেখেছে, যা কম শ্রোতারাই বুঝতে পারে। এ জন্যই এ ধরনের কথা তাদেরকে ফিরিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং এ বিধানকে আমাদের মাঝে বহাল রাখা হয়েছে। এটি হাম্বলী মাজহাবের পূর্ববর্তী কতিপয় আলেম-সহ আরও কিছু ফকীহের মত।

এটা বলা যাবে না যে, মৃত্যু তো বাস্তব সত্য। সুতরাং কারও জন্য মৃত্যুর দুআ করলে তা বদদুআ হবে না। বরং মুসলিমদের জন্য মৃত্যু ও বেদ্বীন হওয়ার দুআ আরও গুরুতর বদদুআ, যেমন কারও জন্য সুস্থতা ও শান্তির দুআ করাটা তার জন্য মর্যাদা।

• **বিবৃতির মাধ্যমে কটূক্তি** : পূর্বে আলোচিত হয়েছে যে, মানুষ যা কিছুকে গালি, কটূক্তি বা কলঙ্কলেপন মনে করে, সেটাই কুফরি—যার দ্বারা কতল আবশ্যক। কেননা কোনো কিছু কুফরি হওয়ার জন্য কটূক্তি হওয়া জরুরি নয়, আর কখনও কখনও একই কথা কোনো অবস্থায় কটূক্তি, অন্য অবস্থায় কটূক্তি নয়। এ থেকে বোঝা গেল—ব্যক্তি, অবস্থা ও কথার ভিন্নতার কারণে কটূক্তিও ভিন্ন ভিন্ন হয়। তার মানে কটূক্তির আলাদা কোনো শাব্দিক বা পারিভাষিক সংজ্ঞা নেই। সুতরাং কোন শব্দটি কটূক্তি হবে, সেটা নির্ভর করবে প্রচলনের ওপর। সামাজের কাছে যেটা কটূক্তি, সাহাবি ও আলেমগণের কথাকে সে ক্ষেত্রেই প্রয়োগ করা হবে। সমাজের কাছে যেটা কটূক্তি নয়, সে ক্ষেত্রে কটূক্তির বিধান প্রযোজ্য হবে না। কয়েক প্রকার বিবৃতিমূলক কটূক্তির আলোচনা আমরা করছি ইন-শা-আল্লাহ।

কোনো সন্দেহ নেই যে, রাসূলের শানে যে-কোনো ধরনের অপমানজনক ও উপহাসমূলক কথা মুসলিমদের নিকট কটূক্তি হিসাবে গণ্য। যেমন : তাঁকে গাধা বা কুকুর বলা, কিংবা তাঁর গুণ হিসাবে মিসকীন বা অপমানজনক ও লাঞ্ছনাকর শব্দ প্রয়োগ করা, কিংবা এ ধরনের কথা বলা যে, তিনি জাহান্নামে যাবেন, সমস্ত মাখলুকের পাপ তার ওপর বর্তাবে ইত্যাদি। তেমনি আক্রমণাত্মক ভাষায় তার প্রতি অবিশ্বাস প্রকাশ

করাও কটূক্তি, যেমন কেউ বলল—সে নবি নয় বরং জাদুকর ও প্রতারক, সে তো তাঁর অনুসারীদের ক্ষতি করবে ইত্যাদি। আর যদি কেউ কটূক্তিমূলক কবিতা রচনা করে, তা হলে তা আরও গুরুতর। কারণ কবিতা অন্যদের মুখেও থাকে।

আর কেউ যদি আক্রমণাত্মক ভাষায় অস্বীকার না করে, বরং সাধারণভাবে অবিশ্বাস প্রকাশ করে, আর রাসূলকে খাটো করে দেখার কোনো লক্ষণও না থাকে, তা হলে তা কটূক্তি হবে না; ধরা হবে, সে তার ধর্মীয় বিশ্বাস প্রকাশ করেছে। হয়তো এ অবিশ্বাসের পিছনে তার হিংসা, বিদ্বেষ বা পূর্বসূরিদের অন্ধ অণুকরণ দায়ী। যেমন : কেউ বলল, আমি তার অনুসারী নয়, বা আমি তার অনুসরণ করব না, আমি তাকে ভালোবাসি না, বা আমি তাকে মানি না ইত্যাদি ইত্যাদি কথা।

আর যদি কেউ বলে, সে রাসূল বা নবি নয়, তা হলে রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে স্পষ্টভাবে মিথ্যা-প্রতিপন্ন করা হয়। আর মিথ্যাপ্রতিপন্ন করা মানেই হলো তাঁকে মিথ্যার সাথে সম্পৃক্ত করা এবং তাঁকে মিথ্যাবাদী বলা। তবে হ্যাঁ, 'সে নবী নয়' আর 'সে মিথ্যাবাদী'-এ দুই কথার মাঝে পার্থক্য রয়েছে। কেননা 'সে নবী বা রাসূল নয়' কথাটি বলার মাধ্যমে মিথ্যা-প্রতিপন্ন করা হয় প্রচ্ছন্নভাবে। কারণ আমরা জানি যে, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'আমি রাসূল।'(তিনি নিজেকে রাসূল বলার পরও এ কথা বলা—'তিনি রাসূল নন' মানে রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মিথ্যা-প্রতিপন্ন করা।) অন্য কারও ব্যাপারে কোনো গুণ নাকচ করা আর রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ব্যাপারে কোনো গুণ নাকচ করা এককথা নয়। আর রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর শানে কোনো গুণ নিছক নাকচ করা আর নাকচ করার সাথে সাথে মিথ্যাবাদী বলাও এককথা নয়। একটি ক্ষেত্রে নাকচ করা আংশিক কটূক্তি আরেকটি নাকচ সর্বদিক থেকেই কটূক্তি।

আল্লাহকে কটূক্তিকারীর বিধান

মুসলিম যদি আল্লাহকে কটূক্তি করে, তা হলে তাকে সর্বসম্মতক্রমে হত্যা করা আবশ্যক। কেননা সে কাফের বরং তার অবস্থা কাফেরের থেকে জঘন্য। এ ব্যক্তির তাওবা কবুল করা হবে কি না, এ বিষয়ে আমাদের সাথিদের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। মতবিরোধ এ অর্থে যে, মুরতাদ ব্যক্তির মতো তাকে তাওবার সুযোগ দেওয়া হবে কি না? সুলতানের সামনে হাজির করার পর (মুরতাদ যেমন তাওবা করলে তার কতলের বিধান রহিত হয়ে যায়, সেভাবে) যদি সেও তাওবা করে, তা হলে তার কতল রহিত হবে কি না?

রাসূলের কটূক্তিকারীকে নিয়ে যেমন দুটি মত, এখানেও দুটি মত। মত দুটি হল—

• **প্রথম** : আল্লাহকে কটূক্তিকারী রাসূলকে কটূক্তিকারীর পর্যায়ের। এটি হলো উমর বিন খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু ও তাঁর-পরবর্তী অনুসারীদের মাজহাব। ইমাম আহমাদ রাহিমাহুল্লাহ-এর কথা এ মাজহাবের পক্ষে। এটি মদীনার ফকিহগণেরও মাজহাব।

এ মত অনুযায়ী স্পষ্ট মাজহাব হলো—কটূক্তিকারীকে ধরার পর তাওবা করার দ্বারা কতল রহিত হবে না। যেমনটি আমরা রাসূলের কটূক্তিকারীর ক্ষেত্রে উল্লেখ করেছি।

এ বর্ণনা অনুযায়ী ইমাম মালিক, লায়স ও ইবনে কাসিম বলেন, তাকে হত্যা করা হবে, তার তাওবা গৃহীত হবে না। (কারণ সে শাতেম।)

• **দ্বিতীয়** : আল্লাহকে কটূক্তিকারী মুরতাদের পর্যায়ের। এ মত অনুযায়ী (মুরতাদের মতো) তাকে তাওবার সুযোগ দেওয়া হবে এবং তার তাওবা কবুল করা হবে। এটি কাযি ইয়া'লা ও শরীফ আবু জাফর হাম্বলী, ইবনুল বান্না ও ইবনে আকীলের বক্তব্য। যদিও তারা আল্লাহর রাসূলকে কটূক্তিকারীর ক্ষেত্রে বলেন, তাকে তাওবার সুযোগ দেওয়া হবে না। এ মতটি মদীনার একদল আলেমেরও মত। শাফেঈ ফকিহগণ এমনটিই উল্লেখ করেন। তারা বলেন, আল্লাহকে কটূক্তিকারী মুরতাদ। ইমাম আবু হানিফার মাজহাবও এটি।

যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কটূক্তিকারীর তাওবা গ্রহণ করার কথা বলেন, তাদের যুক্তি এই যে, আল্লাহর কটূক্তি অর্থ মুরতাদ হয়ে যাওয়া। (যেহেতু মুরতাদের তাওবা কবুল করা হয় সেহেতু কটূক্তিকারীর তাওবাও কবুল করা হবে)

আর যারা আল্লাহর কটূক্তি ও রাসূলের কটূক্তির মাঝে পার্থক্য করে তারা বলেন, আল্লাহকে কটূক্তি করা নিছক কুফরি। এ কুফরি আল্লাহর হকের সাথে সম্পৃক্ত। আল্লাহ জানিয়েছেন, তিনি তাওবাকারীর ওপর থেকে নিজের হক রহিত করেন, এতে তার কোনো ক্ষতি নেই। বান্দার অন্তরে আল্লাহর সম্মান এত বিরাট যে, কোনো ব্যক্তির স্পর্ধা ও দুঃসাহস সে সম্মানের আবরণ ছিন্ন করতে পারে না।

এ আলোচনার দ্বারা আল্লাহর শানে কটূক্তি ও রাসূলের শানে কটূক্তির মাঝে পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়ে যায়। কেননা রাসূলের কটূক্তি হলো বান্দার-হক-সংক্রান্ত বিষয়। আর বান্দার হক তাওবা দ্বারা রহিত হয় না।

(উপরিউক্ত যুক্তি অনুযায়ী), যদি এ দিকটাও লক্ষ করি যে, আল্লাহর শানে কটূক্তি করা আল্লাহর হকের সাথে সম্পৃক্ত, তবুও তো তাওবা করার দ্বারা এ অন্যায় রহিত হবে না। কারণ আল্লাহর হক লঙ্ঘন হলে হদ্দ প্রয়োগ ছাড়া এর ক্ষতি পূরণ হয় না। যেমন ব্যভিচার, চুরি ও মদ্যপানের শাস্তি আল্লাহর হক।[১৩২]

যিম্মি যদি আল্লাহকে কটূক্তি করে

কোনো যিম্মি রাসূলের শানে কটূক্তি করলে যে বিধান, আল্লাহর শানে কটূক্তি করলে একই বিধান। পূর্বে রাসূলের শানে কটূক্তিকারীর বিষয়ে ইমাম আহমাদ-এর সুস্পষ্ট বক্তব্য আলোচনা করা হয়েছে যে—মুসলিম হোক কিংবা কাফের, রাসূলের শানে যে-ই কটূক্তি করবে তাকেই হত্যা করা হবে। আমাদের সাথিগণ, ইমাম মালিক ও তাঁর সঙ্গীগণের মাজহাব এমনই। শাফেঈ মাজহাবের ফকিহগণও একই কথা বলেন। কিন্তু এখানে দুটি মাসআলা আছে—

• **প্রথম মাসআলা :** আল্লাহকে কটূক্তি দুই প্রকার,

১. আল্লাহর শানে এমন কথা বলা—যা কারও ধর্মীয় বিশ্বাস নয়, বরং বক্তা ও অন্যদের কাছেও সেটা তাচ্ছিল্যের অর্থবোধক। এ ধরনের কথা নিঃসন্দেহে কটূক্তি।

---

[১৩২] অপরাধী তাওবা করলেও এগুলো রহিত হবে না। বরং সাজা পেতেই হবে।

২. যিম্মি এমন কোনো কথা বলে যা সে ধর্ম হিসাবে মানে এবং তা শ্রদ্ধার সাথে বিশ্বাস করে। যেমন, খ্রিষ্টানরা বলে—আল্লাহর সন্তান ও স্ত্রী আছে। এ ধরনের কথা যিম্মি যদি প্রকাশ্যে বলে তবে এ নিয়ে মতবিরোধ আছে। কাযি ইয়া'লা ও ইবনে আকীল বলেন, এ-জাতীয় কথা প্রকাশ্যে বলার দ্বারা যিম্মির নিরাপত্তা-চুক্তি ভেঙে যাবে।

ইমাম মালিক ও শাফেঈ বলেন, যা তার ধর্মীয় বিশ্বাস সেটা (প্রকাশ্যে বললেও) কটূক্তি হবে না। কারণ কাফের সে কথা গালি হিসাবে বলে না, বরং শ্রদ্ধা-সহকারে বলে। বাহ্যত এটি ইমাম আহমাদের একটি মত।

• **দ্বিতীয় মাসআলা :** যিম্মির তাওবা-গ্রহণ-প্রসঙ্গ

আমাদের সমস্ত সাথিগণ যিম্মির তাওবা গ্রহণ করার কথা বলেন। শাফেঈ মাজহাবের প্রসিদ্ধ মতও এটি। মালিকিদের মধ্যে ইবনে কাসিম ও অন্যান্যরাও বলেন, তার তাওবা কবুল করা হবে। ইমাম মালিকের বক্তব্য হলো তার তাওবা গ্রহণ করা হবে না, বরং তাকে হত্যা করা হবে। এটি ইমাম আহমাদেরও প্রসিদ্ধ কথা।

সামষ্টিকভাবে যিম্মির কটূক্তিমূলক কথা তিন প্রকার :

প্রথমত : যা তার ধর্মীয় বিশ্বাস। যেমন ঈসা আলাইহিস সালাম-এর সম্পর্কে খ্রিষ্টানদের কথা। এ ধরনের কুফরির বিধান অন্যান্য কুফরির মতোই। তবে এ-জাতীয় কথা প্রকাশ্যে বলার দ্বারা যিম্মির নিরাপত্তা-বিধান শেষ হয়ে যাবে কি না, সে বিষয়ে মতবিরোধ আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। যদিও বলা হয় যে, এ-জাতীয় কথা প্রকাশ্যে বলার দ্বারা নিরাপত্তা-বিধান শেষ হয়ে যায়। তবে পরবর্তীকালে ইসলাম কবুলের দ্বারা তার থেকে কতলের বিধান রহিত হয়ে যাবে বলে আমরা আশাবাদী—এটি সকল ফকিহগণের বক্তব্য।

দ্বিতীয়ত : কটূক্তিকারী এমন কিছু বলে, যেটা সে ধর্ম হিসাবে বিশ্বাস করে। কিন্তু তার এ কথা মুসলিমদের ধর্মের জন্য কটূক্তি। যেমন : এক ইহুদি এক মুয়াযযিনকে আযান দিতে শুনে করে বলেছিল—তুমি মিথ্যা বলেছ।

এক ইহুদি উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর বিচার প্রত্যাখ্যান করেছে। এক যিম্মি আল্লাহর কোনো বিধানকে সমালোচনা করল। এটার বিধান রাসূলকে কটূক্তি করার বিধানের মতোই, যিম্মির নিরাপত্তা-চুক্তি ভেঙে যাবে। ফকিহগণ বিষয়টি এভাবে বলেছেন—'সে আল্লাহ ও তাঁর কিতাবকে মন্দভাবে উল্লেখ করে...'।

আর (আল্লাহকে গালি দিয়ে পরে) ইসলাম গ্রহণের দ্বারা কতল রহিত হওয়ার বিষয়টি রাসূলকে গালি দেওয়ার পর ইসলাম গ্রহণের মাসআলার মতোই।

তৃতীয়ত : যিম্মি মহামহিম আল্লাহর শানে এমন কটূক্তিমূলক কথা বলে যা তার ধর্মীয় বিশ্বাস নয়, বরং তার নিজের ধর্মেও নিষিদ্ধ। যেমন, আল্লাহর শানে অভিশাপ দেওয়া। এক্ষেত্রে তার কটূক্তি আর মুসলিমের কটূক্তির মাঝে কোনো পার্থক্য থাকবে না। বরং মুসলিমের কটূক্তি আরও মারাত্মক হতে পারে। কেননা ইসলাম দ্বারা হারামকে হারাম জানার বিশ্বাস আর নবায়ন হবে না। বরং সে হলো ওই যিম্মির মতো যে কিনা ব্যভিচার, হত্যা কিংবা চুরির পর ইসলাম-গ্রহণ করল। মুসলিমদের ক্ষেত্রে আমাদের বক্তব্য হলো— যদি কোনো মুসলিম আল্লাহকে গালি দেওয়ার পর তাওবা করে, তবুও তার তাওবা আর গৃহীত হয় না। সেক্ষেত্রে কোনো যিম্মি যদি তাওবা করে তা হলে তা আরও আগেই গৃহীত হবে না। রাসূলকে কটূক্তির কথা ভিন্ন। কোনো যিম্মি কোনো মুসলিম নারীর সাথে ব্যভিচার করলেও একই বিধান।[১৩৩]

এই প্রকার কটূক্তি নিয়ে ফকিহগণের তিনটি মত পাওয়া যায় :

১. মুসলিমের মতো যিম্মির তাওবা গ্রহণ করা হবে।

২. তাকে তাওবার সুযোগ দেওয়া হবে না। তবে সে ইসলাম গ্রহণ করলে তাকে হত্যা করা হবে না। এটি ইমাম শাফেঈ এবং ইবনে কাসেমের বক্তব্য এবং ইমাম আহমাদ-এরও একটি মত।

৩. তাকে সর্বাবস্থায় হত্যা করা হবে। এটি ইমাম মালিকের স্পষ্ট বক্তব্য এবং ইমাম আহমাদেরও বক্তব্য। যেমন আমরা বলি—ব্যভিচার ও চুরি করলে তাকে হদ্দ প্রদান করা হবে। কেননা এ-সমস্ত কাজ মুসলিমদের কাছে যেমন হারাম, কাফেরদের কাছেও নিষিদ্ধ। এ-সমস্ত অন্যায়ের মতোই এ প্রকারের কটূক্তি[১৩৪]। অধিকাংশ দলিল এটিকেই প্রমাণ করে।

---

[১৩৩] ব্যভিচারের পর ইসলাম গ্রহণ করলেও শাস্তি রহিত হবে না।

[১৩৪] অর্থাৎ যিম্মি-মুসলিম উভয়ের কাছেই তা নিন্দনীয়

আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে পরোক্ষভাবে কটূক্তিকারীর বিধান

কেউ কোনো গুণ বা নাম ধরে কারও কটূক্তি করল, আর সেই কটূক্তি আল্লাহ ও তাঁর কোনো রাসূলের ওপর বর্তালো, কিন্তু বাহ্যিকভাবে বোঝা গেল, সে আল্লাহ বা তাঁর রাসূলকে বোঝাতে কথাটি বলেনি। এ ধরনের কথাও মূলত হারাম। হারাম হওয়ার বিষয়টি যদি ব্যক্তির অজানা থাকে, তবে তার তাওবা গ্রহণ করা হবে। আর যদি সে হারাম জেনেই বলে, তা হলে তাকে প্রচণ্ডভাবে 'তাযীর' করা হবে। কিন্তু তাকে কাফের বলা হবে না এবং তাকে হত্যা করা হবে না।

উদাহরণ : একব্যক্তি কাল বা সময়কে গালি দিল। তার বিশ্বাস—তার ও তার প্রিয়তমদের মাঝে বিচ্ছেদের পিছনে সময়ই দায়ী; সময়ই তাদের মাঝে বিচ্ছেদ ঘটিয়েছে। অথচ বাস্তবিক অর্থে প্রকৃত কারক তো আল্লাহ। ফলে সে আল্লাহকে উদ্দেশ্য না করলেও, গালি আল্লাহরই ওপর গিয়ে গড়ল। এ দিকেই ইঙ্গিত করে রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

لا تَسُبُّوا الدَّهْرَ فَإِنَّ اللهَ هُوَ الدَّهْرُ

তোমরা সময়কে গালি দিয়ো না। কারণ তিনিই সময়।[১৩৫]

তেমনি একব্যক্তি কাউকে গালি দিয়ে বলল, 'ওই আমুকের পুত...।' এভাবে সে আদম আলাইহিস সালাম পর্যন্ত সবাইকে নিয়েই তাচ্ছিল্যপূর্ণ কথা বলল। নিঃসন্দেহে এতে সে গুরুতর অন্যায় করেছে। কারণ আদম আলাইহিস সালাম-এর পুত্রদের মাঝে তো নূহ, ইদরীস ও শীস আলাইহিমুস সালাম-সহ অন্যান্য নবীগণও আছেন। অথচ এ ধরনের ক্ষেত্রে ব্যাপক অর্থের মাঝে কটূক্তিকারীর উদ্দেশ্য নবীগণ হন না।

অনুরূপভাবে (জুলুমের শিকার) কেউ (বদদুআ করে) বলল, 'আল্লাহ আরবদেরকে

---

[১৩৫] মুসলিম, আস-সহীহ : ২২৪৬

বা বনী ইসরাঈলকে অথবা আদম-সন্তানদেরকে অভিশাপ দিন।' ইবনে আবি যায়দ বলেন, এ ব্যক্তির উদ্দেশ্য নবীগণ নয় বরং তার অভিশাপের লক্ষবস্তু জালেমরা। তবুও (যেহেতু তার কথার মাঝে নবীগণও অন্তর্ভুক্ত হয়ে যান, তাই) তাকে শাসকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শায়েস্তা করা হবে। তবে কেউ কেউ তাকে হত্যা করার কথাও বলেন।

আবার কেউ বলল, 'আল্লাহ আমাকে যত আদেশ করেছেন, সবকিছুতে আমি তাঁর অবাধ্যতা করলাম।'

এ ব্যক্তির বিধানের ক্ষেত্রে আমাদের সাথিদের দুটি মত। একপক্ষ উল্লিখিত মাসআলা অনুযায়ী কিয়াস করেন।

অন্যান্য নবী, উম্মুল মুমিনীন ও সাহাবিদের কটূক্তিকারীর বিধান

অন্যান্য নবীগণকে গালি দেওয়া

অন্যান্য নবীগণকে কটূকথা বলা মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলার মতোই। কেউ এ দুই কটূক্তির মাঝে পার্থক্য করেছেন বলে জানা নেই। তবে কোনো সন্দেহ নেই যে, মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কটূকথা বলা অন্য নবীগণকে বলার চেয়ে গুরুতর।

উম্মুল মুমিনীনদেরকে কটূক্তি

আল্লাহ তাআলা আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে যেই অপবাদ থেকে পবিত্র ঘোষণা করেছেন, যদি কেউ সেই অপবাদ আবার আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে দেয়, সে কুফরি করবে। একাধিক ব্যক্তি জানিয়েছেন যে, এ বিষয়ে ফকিহগণ ঐকমত্য পোষণ করেছেন।

অন্যান্য উম্মুল মুমিনীনদেরকে কটূক্তির বিষয়ে দুটি বক্তব্য :

১. উম্মুল মুমিনীনদেরকে গালি দেওয়া আর সাহাবায়ে কেরামকে গালি দেওয়া একই বিধান। (সাহাবায়ে কেরামকে গালি দেওয়ার বিধান সামনে আলোচিত হবে ইন-শা-আল্লাহ)

২. যে-কোনো উম্মুল মুমিনীনকে অপবাদ দেওয়া আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে অপবাদ দেওয়ার মতোই (কুফরি)।

সাহাবিগণকে কটূক্তি

যে-ব্যক্তি কোনো সাহাবি রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে কটূক্তি করবে, তার সম্পর্কে ইমাম আহমাদ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, তাকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া হবে। তবে তিনি 'তাকে কাফের বলা ও তাকে কতল করার' ফতওয়া দেওয়া থেকে বিরত থাকেন। বরং তিনি বলেন, তাকে শাস্তি দেওয়া হবে, বেত্রাঘাত করা হবে এবং অমৃত্যু তাকে বন্দি রাখা হবে, যতক্ষণ-না সে তাওবা করে ফিরে আসে। এটি ইমাম মালিক রাহিমাহুল্লাহ-এর মাজহাবেরও প্রসিদ্ধ মত।

ইবনুল মুনযির বলেন, সাহাবিগণের কটূক্তিকারীর কতল করাকে কেউ আবশ্যক বলেছেন বলে আমার জানা নাই।

কাযি আবু ইয়া'লা বলেন, যে ব্যক্তি সাহাবাগণকে কটূক্তি করে এবং বিশ্বাস করে যে, তাদেরকে কটূক্তি করা জায়েয—সে কাফের। আর যে তাদেরকে কটূক্তি করা জায়েজ ভেবে নয়, বরং এমনি এমনি কটূক্তি করে, সে ফাসেক। চাই সে সাহাবাগণকে কাফের বলুক কিংবা তাদের ধর্ম নিয়ে আক্রমণাত্মক কথা বলুক। ফকিহগণ এ মতের ওপর আছেন।

যে ব্যক্তি সাহাবাগণকে গালি দেয়, কতিপয় ফকিহ তাকে সুনিশ্চিতভাবে কতলের কথা বলেছেন। তাঁরা রাফেযিকে কাফের বলেন। আমাদের অনেক মুফতি কথাটি স্পষ্ট করে বলেছেন।

আবু বকর আব্দুল আযিয *মুকনি* নামক গ্রন্থে রাফেযিদের বিষয়ে বলেন, রাফেযি যদি কোনো সাহাবিকে গালি দেয়, তা হলে তার কাছে মেয়ে বিয়ে দেওয়া যাবে না।

কোনো কোনো ফকিহ বলেন, যদি কেউ সাহাবিদের দ্বীন বা ন্যায়পরায়ণতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে, বা কটূক্তি করে তা হলে সে কাফের। আর কটূক্তি যদি সাহাবির দ্বীন ও ন্যায়পরায়ণতা নিয়ে বা হয়ে (অন্য কোনো বিষয়ে হয়), যেমন কেউ কোনো সাহাবির পিতাকে কটূক্তি করল কিংবা তাঁকে কটূক্তি করে তাঁর প্রতি ক্ষোভ প্রকাশ করল, তা হলে তাকে কাফের বলা হবে না।

ইমাম আহমাদ শুনলেন, এক ব্যক্তি উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুকে গালি দিচ্ছে। তিনি বললেন, এ ব্যক্তি যিন্দিক। আমার মনে হয় না, সে ইসলামের ওপর আছে।

কাযি আবূ ইয়া'লা (এ কথার ওপর) মন্তব্য করে বলেন, আহমাদ তার কথা 'নিঃশর্ত' রেখেছেন—যে ব্যক্তি রাসূলের কোনো সাহাবিকে গালি দিবে, সে কুফরি করবে।

তবে আব্দুল্লাহ ও আবূ তালেবের বর্ণনায় আছে, ইমাম আহমাদ এই ধরনের কটূক্তিকারীকে হত্যার হুকুম দেওয়া থেকে বিরত থেকেছেন।

(ইমাম আহদের মত অনুযায়ী) 'হদ্দ সাব্যস্ত না হওয়া বরং তাযীর আবশ্যক হওয়া'র দাবি হলো—ইমাম আহমাদ সাহাবির কটূক্তিকারীকে কাফের হওয়ার হুকুম দেননি।[১৩৬]

তা হলে ইমাম আহমাদ যে বলেছেন—'আমি মনে করি না, সে ইসলামের ওপর আছে' কথাটি এ অর্থে যে—ইমাম আহমাদ মনে করেন, সেই কটূক্তিকারী সাহাবাগণের কটূক্তিকে জায়েয মনে করছে। কেননা সেক্ষেত্রে কোনো মতবিরোধ ছাড়াই তাকে কতল করা হবে। ইমাম আহমাদ-এর কথার এই অর্থ হওয়ারও সম্ভাবনা আছে—যে ব্যক্তি সাহাবিগণকে তাঁদের সত্যবাদিতা ও তাঁদের ন্যায়পরায়ণতা নিয়ে কটূকথা বলবে, তাকে হত্যা করা হবে। আর যে ব্যক্তি সাহাবিগণকে কটূক্তি করবে, তবে তা তাঁদের সত্যবাদিতা নিয়ে আক্রমণাত্মক কথা বলে নয় বরং অন্য কোনোভাবে, তাকে হত্যা করা হবে না। যেমন কেউ বলল—

- সাহাবাদের মাঝে ইলমের ঘাটতি ছিল,
- তাঁদের মাঝে রাজনীতির জ্ঞান কম ছিল,
- সাহাবাদের মাঝে সাহসিকতা কম ছিল;
- তাঁদের মাঝে লোভ, দুনিয়ার ভালোবাসা ছিল। ইত্যাদি কথা।

আবার ইমাম আহমাদ রাহিমাহুল্লাহ-এর কথাকে এর বাহ্যিক অর্থের ওপরও বহাল রাখা যেতে পারে, সেক্ষেত্রে সাহাবিদের কটূক্তিকারীদের বিষয়ে ইমাম আহমাদের দুটি রেওয়ায়াত সাব্যস্ত হবে,

১. কটূক্তিকারী কাফের

২. কটূক্তিকারী ফাসেক

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া বলেন, কাযি আবু ইয়া'লার মতটি মূলত এ দুই রেওয়ায়াতের ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত। কাযি আবু ইয়া'লা ছাড়া অন্যান্যরা তার তাকফিরের বিষয়ে দুটি রেওয়ায়াত বর্ণনা করেন।

কাযি আবূ ইয়া'লা বলেন, আল্লাহ তাআলা আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে যেই অপবাদ থেকে পবিত্র ঘোষণা করেছেন, যে ব্যক্তি আবার সেই অপবাদ আয়েশা রাদিয়াল্লাহু

---

[১৩৬] কেননা ক্যাফের হওয়ার অর্থ হলো সে মুরতাদ; আর মুরতাদের শাস্তি কতল

আনহাকে দিবে, সে কুফরি করবে। এ বিষয়ে কোনো মতবিরোধ নেই।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যা বলেন, আমরা এ আলোচনা দুটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করতে পারি—

১. সামগ্রিকভাবে সাহাবাগণকে কটূক্তি করার বিধান

২. কটূক্তিকারীর হুকুম বিষয়ে আলোচনা

প্রথমটি তথা সাহাবাগণকে কটূক্তি করা কুরআন ও হাদীস দ্বারা হারাম।

কুরআনের দলিল :

وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا

'তোমাদের কেউ যেন কারও গীবত না করে।'[১৩৭]

নিঃসন্দেহে সাহাবিগণের দোষ বলার অর্থ গীবত করা।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا

'যারা মুমিন নর-নারীদেরকে তাদের কৃতকর্মের বাইরে অন্য কিছুর দ্বারা কষ্ট দেয় তারা অবশ্যই (নিজেদের ওপর) অপবাদ ও সুস্পষ্ট পাপের বোঝা চাপিয়ে নিল।[১৩৮]

আল্লাহ তাআলা বলেন,

لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ

'আল্লাহ মুমিনদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন যখন তারা গাছের নিচে আপনার কাছে বায়াত করছিল।'[১৩৯]

---

[১৩৭] সূরা হুজুরাত, ৪৯ : ১২

[১৩৮] সূরা আহযাব, ৩৩ : ৫৮

[১৩৯] সূরা ফাতহ, ২৯ : ১৮

আর হাদীসে সাব্যস্ত আছে যে, যারা (হুদায়বিয়ায়) গাছের নিচে বায়াত করেছিল, তাঁদের কেউই জাহান্নামে যাবে না।[১৪০]

আল্লাহ তাআলা বলেন,

لَّقَد تَّابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ

'তিনি নবী, মুহাজিরীন ও আনসারদের তাওবা কবুল করেছেন।'[১৪১]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন,

وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ

'যারা তাদের পরে এসে বলছে—হে আমাদের রব! আপনি আমাদেরকে এবং আমাদের ভাইদেরকে ক্ষমা করুন, যারা ইসলামে আমাদেরকে ছাড়িয়ে গেছেন; আর আপনি আমাদের অন্তরে মুমিনদের জন্য কোনো বিদ্বেষ স্থাপন করবেন না। হে আমাদের রব! নিঃসন্দেহে আপনি পরম মমতাময় ও চিরদয়ালু।'[১৪২]

এ-সমস্ত আয়াত থেকে জানা গেল, সাহাবিদের জন্য ইসতিগফার পাঠ করা, বিদ্বেষ থেকে অন্তরকে পবিত্র রাখা আল্লাহর পছন্দনীয় বিষয়। আল্লাহ তাআলা এ কাজের প্রতি সন্তুষ্ট হন এবং আমলকারীর প্রশংসা করেন।

হাদীস থেকে প্রমাণ

বুখারী ও মুসলিমে আছে, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

لَا تَسُبُّوْا أَصْحَابِيْ، لَا تَسُبُّوْا أَصْحَابِيْ، فَوَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِه لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا أَدْرَكَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيْفَه

'তোমরা আমার সাহাবিদেরকে গালি দিয়ো না। সেই সত্তার কসম, যার হাতে আমার প্রাণ! যদি তোমরা উহুদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণ-রৌপ্য দান করো,

[১৪০] মুসলিম, আস-সহীহ : ২৪৯৬

[১৪১] সূরা তাওবা, ৯ : ১১৭

[১৪২] সূরা হাশর, ৫৯ : ১০

তবুও তা তাদের এক মুদ্দ সমপরিমাণ ও এর অর্ধেকও হবে না।'[১৪৩]

রাসূল সল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেন, 'আল্লাহ তাআলা আমাকে (নবী হিসাবে) নির্বাচন করেছেন, আর আমার জন্য আমার সাহাবিদেরকে নির্বাচন করেছেন। তিনি আমার জন্য তাদের মধ্য হতে কাউকে পরামর্শদাতা, কাউকে সাহায্যকারী, কাউকে (বৈবাহিক-সূত্রে) আত্মীয় বানিয়েছেন। সুতরাং যে ব্যক্তি তাদেরকে কটূক্তি করবে তার ওপর আল্লাহ, ফেরেশতা ও সমস্ত মানুষের অভিশাপ। আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাদের ফরয ও নফল কিছুই কবুল করবেন না।[১৪৪]

রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেন,

اللهَ اللهَ فِيْ أَصْحَابِيْ لَا تَتَّخِذُوْهُمْ غَرَضًا بَعْدِيْ فَمَنْ أَحَبَّهُمْ فَبِحُبِّيْ أَحَبَّهُمْ، وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِيْ أَبْغَضَهُمْ، وَمَنْ آذَاهُمْ فَقَدْ آذَانِيْ، وَمَنْ آذَانِيْ فَقَدْ آذَى اللهَ، وَمَنْ آذَى اللهَ يُوْشِكُ أَنْ يَأْخُذَهُ

'তোমরা আমার সাহাবিদের বিষয়ে আল্লাহ আল্লাহকে ভয় করো। আমার পরে তোমরা তাদেরকে লক্ষ্যবস্তু বানিয়ো না। সুতরাং যে ব্যক্তি তাদেরকে ভালোবাসবে, সে আমাকে ভালোবাসল; আর যে ব্যক্তি তাদের প্রতি বিদ্বেষ রাখল সে আমার প্রতি বিদ্বেষ-পোষণ করল। যে তাদেরকে কষ্ট দিল সে আমাকে কষ্ট দিল। আর যে আমাকে কষ্ট দিল সে আল্লাহকে কষ্ট দিল; আর যে আল্লাহকে কষ্ট দিল, খুব সম্ভব আল্লাহ তাকে পাকড়াও করবেন।'[১৪৫]

অন্য শব্দে : 'যে ব্যক্তি আমার সাহাবিদেরকে গালি দিবে সে আমাকে গালি দিল; আর যে আমাকে গালি দিল সে মূলত আল্লাহকে গালি দিল।'[১৪৬]

রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেন, 'যে ব্যক্তি আমার সাহাবিদেরকে কটূক্তি করে আল্লাহ তাকে অভিশাপ দিন।'[১৪৭]

সাহাবাগণের কটূক্তি যখন এত গুরুতর, তখন কটূক্তির ন্যূনতম শাস্তি 'তাযীর'।

---

[১৪৩] বুখারী, আস-সহীহ : ৩৬৭৩; মুসলিম, আস-সহীহ : ২৫৪০

[১৪৪] হাকিম, আল-মুস্তাদরাক: ৩/৬৩২; তাবরানি, আল-কাবীর: ১৭/১৪০

[১৪৫] তিরমিযি, আস-সুনান: ৩৮৬২

[১৪৬] ইবনে আদী, আল-কামিল

[১৪৭] তিরমিযি, আস-সুনান: ৩৯৫৮

আমাদের জানামতে এতটুকু নিয়ে সাহাবি ও তাবেয়ীগণের মাঝে কোনো মতবিরোধ নেই। আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের সবাই একমত যে, উম্মাহর জন্য ওয়াজিব হলো সাহাবাগণের প্রশংসা করা, তাদের জন্য ইস্তিগফার পড়া, তাদের প্রতি কোমল ও সন্তুষ্ট থাকা, তাদের সাথে ভালোবাসা ও বন্ধুত্বের সম্পর্কে বিশ্বাস রাখা, যারা তাদের শানে কটূক্তি করে, তাদেরকে শাস্তি দেওয়া।

তারপর কারও কারও মত হলো, সাহাবাগণকে কটূক্তি করার কারণে কাউকে কতল করা হবে না। তাদের যুক্তি নিম্নোক্ত হাদীস,

لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ

'তিনটির কোনো একটি ব্যতিত মুসলিমের রক্ত হালাল হয় না'...... এই হাদীসটি।

তা ছাড়া সাহাবাগণের মাঝেও কেউ কেউ অন্য কোনো সাহাবিকে গালি দিয়ে ফেলতেন। কিন্তু এ কারণে কাউকে কখনও কাফের বলা হতো না।

কারও কারও মতে, সাহাবিগণকে যে ব্যক্তি কটূক্তি করবে, তাকে কাফের বলা হবে এবং তাকে কতল করা হবে। তাদের যুক্তি হলো, আল্লাহ তাআলা বলেন,

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ۚ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ۖ .... يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ ۗ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

'মুহাম্মাদ হলেন আল্লাহর রাসূল এবং যারা তার সাথে আছে, তারা কাফেরদের ওপর কঠিন এবং পরস্পরের প্রতি দয়ালু। তুমি তাদেরকে দেখবে রুকু ও সিজদারত অবস্থায়—তারা আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি অন্বেষণ করছে, তাদের লক্ষণ হলো চেহারায় তাদের সিজদার চিহ্ন... যেন আল্লাহ তাদের মাধ্যমে কাফেরদেরকে ক্রুদ্ধ করেন।'[১৪৮]

সুতরাং সাহাবাদের দ্বারা যারা ক্রুধান্বিত হয় তারা কাফেরদের কিছু দোষে দুষ্ট—যে দোষগুলোর মাধ্যমে আল্লাহ ওদেরকে অপদস্থ করেছেন, লাঞ্ছিত করেছেন এবং ক্ষেপিয়েছেন। কাফেরদের কুফরির সাজা হিসাবে যে দোষ দিয়ে তাদেরকে অপমান করেছেন, সে দোষ যার মধ্যে থাকবে সেও অবশ্যই ওদের মতো কাফেরই হবে।

[১৪৮] সূরা ফাতহ, ৪৮ : ২৯

কেননা মুমিনকে কুফরির সাজা দেওয়া হয় না। এখানে বিষয়টি স্পষ্ট যে, আল্লাহ উক্ত আয়াতে সাহাবাদের প্রতি ক্ষোভকে সঙ্গত একটি দোষের সাথে শর্তযুক্ত করেছেন। কেননা সাহাবাদের প্রতি কাফেরকে রাগিয়ে তোলার জন্য তার কুফরিই উপযুক্ত।

সাহাবগণের প্রতি কাফেরকে রাগিয়ে তোলার জন্য কুফর যেহেতু অবশ্যম্ভাবী, সেহেতু কাফেরদের প্রতি আল্লাহ যাদেরকে রাগাবেন, অবশ্যই তাদের মাঝেও সেই অবশ্যম্ভাবী কারণটি থাকবে! আর তা হলো কুফরি। ইমাম আহমাদ-এর কথা 'আমি তাকে ইসলামের ওপর দেখতে পাচ্ছি না' দ্বারা এটাই উদ্দেশ্য।

আরেকটি দলিল—রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'যে ব্যক্তি তাদের প্রতি বিদ্বেষ রাখবে, তারা আমার প্রতি বিদ্বেষ রাখল; যে তাদেরকে কষ্ট দিল সে আমাকে কষ্ট দিল; আর যে তাদেরকে কটূক্তি করল তার ওপর আল্লাহ, ফেরেশতাগণ ও সমস্ত মানুষের অভিশাপ; আল্লাহ তার ফরজ-নফল কিছুই কবুল করেন না।'[১৪৯]

আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে কষ্ট দেওয়া তো কুফরি। সুতরাং সাহাবাগণকে সাহাবি হওয়ার আগে ও পরে কষ্ট দেওয়া এবং অন্যান্য মুসলিমকে কষ্ট দেওয়ার মাঝে পার্থক্য এই হাদীস দ্বারা স্পষ্ট হয়ে যায়। সাহাবি যদি সাহাবি (মুসলিম) থেকেই মারা যান তা হলে তাকে কষ্ট দেওয়া মানে তো তার সঙ্গী (নবীকে) কষ্ট দেওয়া। ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'তোমরা মানুষকে তাদের বন্ধু দ্বারা বিবেচনা করো।'[১৫০] প্রবাদ আছে—'ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা কোরো না, জিজ্ঞাসা করো তার বন্ধু সম্পর্কে।' কেননা প্রত্যেক ব্যক্তিই তার সঙ্গীকে অনুসরণ করে।

ইমাম মালিক বলেন,' সাহাবিগণের কটূক্তিকারীরা মূলত আল্লাহর রাসূলকে দোষারোপ করতে চায়। কিন্তু তা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তাই তারা সাহাবিদের নামে দোষ বলে, যেন বলা যায়—'খারাপ মানুষ বলেই তো তাঁর সঙ্গীরাও খারাপ।'

ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, তোমরা মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাহাবিগণকে কটূক্তি করো না, তাদের এক একজনের দাঁড়ানোর স্থান তোমাদের সমস্ত আমল থেকেও উত্তম।[১৫১]

আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে একটি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন—মুমিন ছাড়া কেউ তোমাকে ভালোবাসবে না, আর মুনাফিক

[১৪৯] তাবরানী, কাবীর : ১৭/১৪০

[১৫০] ইবনে বাত্তা, আল-ইবানাহ : ৪৩৯

[১৫১] ইবনে মাজাহ, মুকাদ্দামাতুস সুনান : ১৬২

ছাড়া কেউ তোমার প্রতি বিদ্বেষ রাখবে না।

বুখারী ও মুসিলিমে আছে : ঈমানের নিদর্শন হলো আনসারদেরকে ভালোবাসা আর নিফাকের লক্ষণ হল আনসারদের প্রতি বিদ্বেষ রাখা।[১৫২]

বুখারী ও মুসিলিমে আরও আছে : আনসারকে ভালোবাসে মুমিন ছাড়া কেউ না; আনসারকে যে ঘৃণা করে সে মুনাফিক ছাড়া কিছু না। যে তাদেরকে ভালোবাসবে আল্লাহ তাদেরকে ভালোবাসবেন। আর যে তাদের প্রতি বিদ্বেষ রাখবে, আল্লাহ তার প্রতি বিদ্বেষ রাখবেন।

সুতরাং যে তাদেরকে গালি দিবে, সে তো সাহাবিগণের প্রতি আরও বিদ্বেষ-পোষণ করবে। সুতরাং তার মুনাফিক হওয়া অবধারিত। রাসূল সল্লাল্লাহু আলাহি ওয়া সাল্লাম উল্লিখিত হাদীসে শুধু আনসারদের কথা বলেছেন, কেননা তাদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, যাঁরা মুহাজিরদের পূর্ব থেকেই বাড়িতে ছিলেন এবং ঈমান এনেছিলেন...। তাঁরাই আল্লাহর রাসূল ও সাহাবিগণকে থাকার জায়গা দিয়েছেন, সাহায্য করেছেন এবং তাঁদের হয়ে শত্রুদের হামলা প্রতিহত করেছেন; তাঁরা আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠায় তাদের জান-মাল ব্যয় করেছেন। যখন মুহাজিররা ছিলেন আগন্তুক, অচেনা ও সহায়-সম্বলহীন, তখন তাঁরা তাঁদের সম্পদ মুহাজিরদের সাথে সমানভাবে ভাগ করে নিয়েছেন। তখন তিনি মানুষকে আনসারদের মর্যাদা বোঝাতে চাইলেন। কারণ তিনি জানেন, মানুষ তো অনেক কিন্তু আনসারের সংখ্যা কম। ভালোবাসা ও বিদ্বেষের বিষয়টি শুধু আনসার নন, মুহাজিরদের জন্যও প্রযোজ্য। কেননা যাঁরা আনসারদের সাথে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে সাধ্যমতো সাহায্য করেছে তাঁরা সকলেই বাস্তবিক অর্থে আনসার সমগোত্রীয়। সুতরাং যাঁরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে সাহায্য করেছে তাঁদের সাথে বিদ্বেষ-পোষণ করা নিফাকি। যে-সমস্ত সাহাবি আল্লাহর রাসূলকে সাহায্য করেছেন তাঁরা সবাই এ মর্যাদার অন্তর্ভুক্ত আর তাঁদের সাথে বিদ্বেষ-পোষণকারীরা মুনাফিক-কাফের, যেমন পূর্বে উল্লেখ করেছি।

তালহা বিন মুসাররিফ বলেন, বলা হয়—বনু হাশেমের সাথে বিদ্বেষ-পোষণ করা নিফাকি, আবু বকর ও উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমদের সাথে বিদ্বেষ-পোষণ করা নিফাকি; আর আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে নিয়ে সংশয়কারী যেন খোদ সুন্নাহ নিয়ে সংশয়কারী।

আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, শেষ

---

[১৫২] বুখারী, আস-সহীহ : ১৭; মুসলিম, আস-সহীহ: ৭৪

জামানায় আমার উম্মতের মাঝে কিছু লোকের প্রকাশ ঘটবে, তাদেরকে 'রাফেদাহ' বলা হবে। তারা ইসলামকে ছেড়ে দিবে।[১৫৩]

আবু ইয়াহইয়া আল-হিম্মানী আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন—নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বলেন, হে আলী! তুমি ও তোমার দল জান্নাতে (যাবে) আর একটা সম্প্রদায়—তাদের পদবি থাকবে, তাদেরকে রাফেদা বলা হবে। যদি তুমি তাদেরকে পাও, হত্যা করবে। কারণ তারা মুশরিক। আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, তারা আহলুল বাইয়েত (নবীর পরিবার ও বংশধরদের)-এর প্রতি ভালোবাসা দেখাবে অথচ তারা ওমন নয়। তাদের লক্ষণ হলো তারা আবু বকর ও উমরকে গালিগালাজ করে।[১৫৪]

অন্য শব্দে : আমাদের পরে একটি সম্প্রদায় আসবে, তারা আমাদেরকে ভালোবাসার দাবি করবে আমাদের নামে মিথ্যা বলবে। তারা হবে দ্বীন থেকে খারিজ। তাদের একটি লক্ষণ হলো তারা আবু বকর ও উমরকে গালিগালাজ করবে।[১৫৫]

বাগাওয়ী হাদীসটি বর্ণনা করেন। তার বর্ণনায় আরও আছে, তোমরা যেখানেই তাদেরকে পাও, হত্যা করো; কেননা তারা মুশরিক।

হাদীসটি আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে মাওকূফ[১৫৬] ও মারফূ[১৫৭] দুভাবেই বর্ণিত হয়েছে।

ইবনে বাত্তাহ আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আল্লাহ আমাকে নির্বাচন করেছেন এবং তিনি আমার জন্য আমার সাহাবিদেরকে নির্বাচন করেছেন। তিনি তাদেরকে আমার সাহায্যকারী বানিয়েছেন এবং তাদেরকে আমার আত্মীয়ও বানিয়েছেন (কাউকে কাউকে)। শেষ জামানায় কিছু মানুষ আসবে, তারা (মানুষের সামনে) সাহাবিদেরকে খাটো করবে। তোমরা তাদেরকে বন্ধু বানিয়ো না, তাদের সাথে ওঠাবসা কোরো না। তাদের সাথে তোমাদের মেয়ে বিয়ে দিয়ো না। সাবধান! তাদের সাথে জামাতে সালাত পড়ো না,

---

[১৫৩] আহমাদ, আল-মুসনাদ : ১/১৩০, যয়ীফ।

[১৫৪] আহমাদ, আস-সুন্নাহ: ২/৫৪৭-৫৪৮

[১৫৫] লালকাঈ : ৮/১৪৫৪

[১৫৬] মাওকূফ হলো সেই হাদীসে, যেখানে সাহাবি বলেন না যে, এটি রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন। ফলে সেটি সাহাবির কথা হওয়ারও সম্ভাবনা থাকে।

[১৫৭] যে হাদীসে সাহাবি বলে দেন, এটি রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন।

তাদের জানাযাও পড়ো না। তাদের ওপর আল্লাহর লানত নামুক।[১৫৮] রেওয়ায়াতটিতে আপত্তি আছে।

এ বিষয়ে এর চেয়ে দুর্বল হাদীস বর্ণিত হয়েছে আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে। কিন্তু এটি সাহাবিদের বাণী। আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তার কাছে খবর পৌঁছল, আব্দুল্লাহ বিন সাওদা আবু বকর ও উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমকে গালিগালাজ করে। তখন আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নিলেন। এটি আবুল আহওয়াস থেকে সংরক্ষিত। নাজ্জাদ, ইবনে বাত্তাহ, লালকাঈ-সহ অন্যরাও এটি বর্ণনা করেছেন।

ইবরাহীমের মুরসাল হাদীস ভালো। আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু হত্যা করার ইচ্ছা-প্রকাশ করেছেন মানেই হলো, তাঁর কাছে ওই ব্যক্তির রক্ত হালাল। তবে তিনি তাকে ফেতনার আশংকা থাকায় ছেড়ে দিয়েছেন। যেমন রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিছু কিছু মুনাফিককে হত্যা করা থেকে বিরত থেকেছেন।

আব্দুর রহমান বিন আবযা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, যদি আমি কাউকে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু ও উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কটূক্তি করতে শুনি, আমি তার গর্দান উড়িয়ে দিব।[১৫৯]

আব্দুর রহমান রাদিয়াল্লাহু আনহু হলেন বিখ্যাত সাহাবি। উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর সময় তিনি পবিত্র মক্কার গভর্ণর ছিলেন। আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁকে খুরাসানের গভর্ণর নিযুক্ত করেন।

আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, কেউ যদি আমাকে আবু বকর ও উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুম-এর ওপর প্রাধান্য দেয়, আমি তাকে মিথ্যা অপবাদের শাস্তিস্বরূপ বেত্রাঘাত করব। রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পর শ্রেষ্ঠ মানুষ আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু, তারপর উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু।[১৬০] হাদীসটি আব্দুল্লাহ বিন আহমাদ, ইবনে বাত্তাহ ও অন্যন্যরা বর্ণনা করেন। এ বিষয়ে আরও প্রচুর 'আসার' বা সাহাবিদের বাণী' রয়েছে।

ইমাম আহমাদ রাহিমাহুল্লাহ সহীহ সনদে ইবনে আবি লাইলা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, দুই ব্যক্তি আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু ও উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে নিয়ে

---

[১৫৮] খাল্লা, আস-সুন্নাহ : ২/৪৮৩; ইবনে হিব্বান এটিকে ভিত্তিহীন বলেছেন।

[১৫৯] আল-খিলাল, আস-সুন্নাহ: ১/২৫৫

[১৬০] আহমাদ, আল-ফাযায়েল : ১/৮৩

বিতর্ক করছিল। একজন বলল, উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে শ্রেষ্ঠ। জারুদ বললেন, আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বরং উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে শ্রেষ্ঠ। উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কাছে এ খবর পৌঁছল। যে তাকে শ্রেষ্ঠ বলেছিল, উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে ডেকে এমনভাবে বেত্রাঘাত করলেন যে, তার পা পর্যন্ত নড়ে উঠল। তারপর তিনি জারুদের দিকে ফিরে বললেন, সাবধান হয়ে যাও। এরপর উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পরে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু এই এই ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ ছিলেন; যে এর ব্যতিক্রম কথা বলবে, তাকে মিথ্যা অপবাদের হদ্দ প্রদান করা হবে।[১৬১]

স্বয়ং খুলাফায়ে রাশিদার দুইজন ব্যক্তি—উমর ও আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুম এমন ব্যক্তিকে শাস্তি দিতেন, যে ব্যক্তি তাঁদেরকে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে শ্রেষ্ঠ বলত। অথচ সেগুলো ছিল নিছক শ্রেষ্ঠত্ব দেওয়া, গালি দেওয়া নয়। বোঝা গেল, তাদের কাছে তবে সাহাবাদেরকে গালি দেওয়া আরও কত গুরুতর ছিল!

উপসংহার

যে ব্যক্তি আবু বকর বা উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমকে গালি দেওয়ার সাথে সাথে দাবি করে যে, আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু হলেন প্রভু বা নবী, অথবা জিবরীল আলাহিস সালাম ওহি (আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কাছে নেওয়ার পরিবর্তে) ভুলে মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে নিয়ে গেছেন—কোনো সন্দেহ নেই যে, সে ব্যক্তি কাফের; বরং যে তার কাফের হওয়া নিয়ে সংশয়ে পড়বে, তার কুফরি নিয়েও কোনো সংশয় নেই।

তেমনি ওই ব্যক্তিও কাফের— যে দাবি করবে যে, কুরআনে কোনো অংশ কম আছে, কুরআনের কোনো কিছু গায়েব আছে, কিংবা কুরআনের বতেনি কোনো অর্থ শারঈ আমলকে রহিত করে, ইত্যাদি ইত্যাদি কথা। এ-জাতীয় কথা বলে 'কারামাতিয়া' ও 'বাতিনিয়্যারা'। এদের মধ্যে তানাসুখিরাও আছে। এদের কাফের হওয়া নিয়ে কোনো মতবিরোধ নেই।

সাহাবিগণের সত্যবাদিতা বা দ্বীন নিয়ে নয়, (বরং অন্য কোনো বিষয়ে) কেউ যদি তাঁদের কটূক্তি করে, যেমন কেউ কোনো সাহাবিকে কটূক্তি করে কৃপণ-ভীরু-

---

[১৬১] কিছু ক্ষেত্র উল্লেখ করে তিনি মূলত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর শ্রেষ্ঠত্বের দৃষ্টান্ত দিলেন।

দূনিয়ালোভী-স্বল্পজ্ঞানী ইত্যাদি বলে, তা হলে সে বিচার ও 'তাযীরে'র উপযুক্ত; তবে তাকে কাফের বলা যাবে না। যে-সমস্ত আলেম সাহাবার শানে কটূক্তি করাকে কুফরি বলেননি, সম্ভবত তারা এ ধরনের কটূক্তির কথাই বলেছেন।

আর যে সাহাবিগণের ওপর লানাত করবে ও (ব্যক্তিগত কোনো বিষয়ে) তাদের কুৎসা বলবে, তার বিধান কী হবে—এটা মতবিরোধের বিষয়। কারণ এ বিষয়ে দ্বিধা থেকে যায় যে, অভিশাপ কি তাদের প্রতি অবিশ্বাস থেকে নাকি রাগবশত।

আর যে ব্যক্তি আরও সীমা ছাড়িয়ে দাবি করবে, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মৃত্যুর পর দশ-পনেরো জন সাহাবি ব্যতিত সবাই মুরতাদ হয়ে গেছে কিংবা ফাসেক হয়ে গেছে, তারাও কাফের—কোনো সন্দেহ নেই। বরং এতেও কোনো সন্দেহ নেই যে, তার কাফের হওয়া নিয়ে যারা সন্দেহ করবে তারাও কাফের।

এসব কটূক্তিকারীদের ওপর মহান আল্লাহর অনেক দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি আরোপিত হয়েছে; আর বহু রেওয়ায়াতে বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা দুনিয়া ও আখিরাতে এদের চেহারা বিকৃত করেন।

মূলকথা, কিছু কিছু কটূক্তিকারীর কাফের হওয়া নিয়ে কোনো সংশয় নেই। আর কিছু কটূক্তিকারীকে কাফের বলা যাবে না। আর কোনো কোনো কটূক্তিকারী কাফের কি না, দ্বিধা-সংশয় রয়েছে। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার জায়গা এটা নয়। বিস্তারিত আলোচনা করলে বইয়ের কলেবর অনেক দীর্ঘ হয়ে যাবে। সময়ের দাবি অনুযায়ী এতটুকুই। আল্লাহু আলামু।

খ্রিস্টানদের কিছু নেতৃস্থানীয় লোক একবার মঙ্গোলীয় রাজার সাথে দেখা করতে এল। ওই রাজাও খ্রিস্টান ছিল। খ্রিস্টানদের প্রতিনিধি-দলের মধ্যে এক পাদ্রি ছিল। রাজাকে খুশি করার জন্য সে নবী ﷺ-এর শানে আজেবাজে কথা বলতে শুরু করল। পাশেই রাজার একটি শিকারি কুকুর বাঁধা ছিল। ওই লোকটার কথা শুনে ঘেউ-ঘেউ করতে শুরু করল কুকুরটি। উপস্থিত লোকদের একজন বলল, 'তুমি মুহাম্মাদের নামে আজেবাজে বকছ, তাই হয়তো প্রাণিটি এমন করছে।'

পাদ্রি পাত্তা দিল না লোকটার কথায়। সে আবারও রাসূল ﷺ-এর শানে বেয়াদবি করতে লাগল। নির্বোধের মতো উচ্চস্বরে নবী ﷺ-কে নিয়ে মন্দ কথাবার্তা বলতে থাকল। ঠিক এই মুহূর্তেই পাশে-থাকা কুকুরটি শেকল ছিঁড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল পাদ্রির ওপর। এক কামড়ে গলার শ্বাসনালী আলাদা করে ফেলল পাদ্রির দেহ থেকে। (ইবনে তাইমিয়্যা, আদ-দুরারুল কামিনাহ, ৩/২০২)

সুবহানাল্লাহ! একটা কুকুরও রাসূল ﷺ-কে গালি দিতে দেখে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে!

আর আমরা?

আমাদের সে অনুভূতি কোথায়?

কোথায় আমার রাগ? কোথায় আমাদের ভালোবাসা?

সৃষ্টির শুরু থেকে নিয়ে কিয়ামত পর্যন্ত যত জন মানুষ এই দুনিয়ায় আসবেন, তাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হলেন মুহাম্মাদ ﷺ। তিনি কেবল সমগ্র মানবজাতির ইমাম নন, তিনি সমস্ত নবীদেরও ইমাম। আর বিচার-দিবসেও তাঁর মর্যাদাকে সমুন্নত করে দেবেন মহামহিম আল্লাহ। আমাদের ওপর দয়াময় আল্লাহ এতটাই অনুগ্রহ করেছেন যে, সেই মহানুভব মানুষটির উম্মাহ করে এই দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন। কিন্তু আফসোসের বিষয় হলো, সাইয়িদুল বাশার মুহাম্মাদ ﷺ-এর লাখ লাখ উম্মাহ জীবিত থাকা সত্ত্বেও আজ তাঁর ইজ্জতের ওপর হামলা করছে কুফফার ও তাদের সহযোগীরা। তথাকথিত 'মত প্রকাশের স্বাধীনতা'র নামে আল্লাহর রাসূলকে নিয়ে প্রতিনিয়ত ব্যাঙ্গ-বিদ্রুপ করে যাচ্ছে ওরা। আল্লাহর শপথ! এমন জাতির ওপর কখনোই আল্লাহর সাহায্য নাযিল হয় না, যে জাতি আল্লাহর রাসূলের সম্মান রক্ষা করতে জানে না।

আজ কোথায় আব্দুল্লাহ ইবনে উনাইসরা? কোথায় উম্মে ইমারার সন্তানেরা? কোথায় মাআজের মতো কিশোররা? হে মুহাম্মাদের উম্মত! তোমরা কি মরে গেছ? হে উম্মাহর যুবকেরা! তোমরা কি শক্তি খুইয়ে ফেলেছ? ধরণির শ্রেষ্ঠ মানুষটির সম্মান রক্ষার জন্য যদি তোমার না এগিয়ে আসো তবে অপেক্ষা করো সেই দিনের, যেদিন মহা-প্রতাপশালী আল্লাহ সমস্ত কৃতকর্মের হিসাব হাতেনাতে বুঝিয়ে দেবেন।